দাম : দশ টাকা

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের
দেবোত্তর ভূমির দখল
প্রক্রিয়া অব্যাহত
— পৃঃ ১৫

স্বস্তিকা

আত্মসন্তুষ্টি ঝেড়ে
ফেলতে হবে
—পৃঃ ২২

৭০ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা।। ২ এপ্রিল ২০১৮।। ১৮ চৈত্র - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ১৮ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২ এপ্রিল - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

খোলা চিঠি : কলকাতায় সরযূনদীর ধারে হবে রামমন্দির
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১০

রাজ্যসভায় বিজেপির বিপুল জয়, গোরক্ষপুর-ফুলপুরের হারের মধুর প্রতিশোধ ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১১

মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম আর নিরঙ্কুশ নয়
▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১২

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দেবোত্তর ভূমির দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত
▯ ১৫

মনুষ সমর্থন করবেন নরেন্দ্র মোদীকেই
▯ অমিতাভ সেন▯ ১৭

জোটের রাজনীতি না রাজনীতির জোট
▯ ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ ▯ ১৯

আত্মসন্তুষ্টি ঝেড়ে ফেলতে হবে
▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২২

কিষানসভার মুম্বই অভিযান সফল হলেও ২০১৯-এ অ্যাডভান্টেজ বিজেপি ▯ শৌভিক চক্রবর্তী ▯ ২৭

উত্তর দিনাজপুরের প্রাণগঙ্গা কুলিক নদী
▯ ড. বৃন্দাবন ঘোষ ▯ ৩১

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : নব অবতারে হরি ঘোষের গোয়াল
▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৭ ▯ অন্যরকম : ৩৮ ▯ খেলা : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪১-৪১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শিক্ষায় মাতৃভাষা

শিক্ষায় মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধস্বরূপ। কথাটি রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু আজকের পশ্চিমবঙ্গ এই ভাবনা থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছে। গ্রামের স্কুলগুলিতে এখনও বাংলাভাষার মর্যদা অক্ষুণ্ণ থাকলেও শহরের, বিশেষ করে কলকাতার ছেলে-মেয়েরা ইংরেজিতেই পড়াশুনা করতে অভ্যস্ত। প্রশ্ন উঠেছে, এই ব্যবস্থা কতদূর যুক্তিসঙ্গত? মাতৃভাষাকে ভুলিয়ে দেওয়ার অর্থ কি পরম্পরাকে ভুলিয়ে দেওয়া নয়? সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভাতেও আলোচিত হয়েছে বিষয়টি। সভার সিদ্ধান্ত, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক তো বটেই, সম্ভব হলে উচ্চশিক্ষাও মাতৃভাষা বা দেশীয় ভাষার মাধ্যমে দিতে হবে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— শিক্ষায় মাতৃভাষা। লিখবেন গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজ্যে শ্রীরামনবমী

শ্রীরামনবমীকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শ্রীরাম ও মহাবীরের পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মহাসমারোহে পালিত হইল। গত বৎসরেই এই রাজ্য শ্রীরামনবমীকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণ মানুষের হর্ষোল্লাস প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এই বৎসর সেই হর্ষোল্লাস আরও বিপুল উৎসাহে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া জনমানসকে উদ্বেলিত করিয়াছে। শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, এমনকী রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলও এই উদ্যোগে শামিল হইয়াছিল। যে রাজ্যের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ হইতে একটি ইটও পাঠানো যাইবে না বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়াছিলেন, জীবিত থাকিলে এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার কী অবস্থা হইত, 'বেচারা' শব্দ ছাড়া আর কী ভাবেই বা তাহা প্রকাশ করা যায়। 'সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা'-র ভূত এখনও তাহাদের কাঁধ হইতে নামে নাই। এই দৃশ্য দর্শনে তাঁহার অনুগামীরা 'সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা'-র সন্ধান পাইয়াছেন। একদা যাহারা স্বামী বিবেকানন্দকে 'ভণ্ড সন্ন্যাসী' বলিয়া গালি দিয়াছে, তাহারাই এখন স্বামীজীর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করিতেছে। তাই রামনবমী উদ্‌যাপনের বিরোধিতা যে তাহাদের কাছে 'ঐতিহাসিক ভুল' বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

অথ তৃণমূল কথা। প্রথমে এই দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামনবমী শোভাযাত্রার উদ্যোগীদের নানাভাবে চমকাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষে তাঁহার দলের লোকজনই কপালে তিলক পরিয়া শ্রীরামনবমী শোভাযাত্রার আয়োজন করিয়াছে। তৃণমূলের বিশিষ্ট নেতা-নেত্রী ও মন্ত্রীরা এইসব আয়োজনের পুরোভাগে থাকিয়া নেতৃত্ব দিয়াছেন। শাসকদলের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তমলুকে রামনবমী উৎসবে শামিল হইয়াছেন। 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনিও দিয়াছেন। আলিপুরদুয়ারে রামনবমীর শোভাযাত্রায় তৃণমূল-বিজেপি নেতারা পাশাপাশি হাঁটিয়াছেন। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীও গলায় পৈতা ঝুলাইয়া মন্দিরে মন্দিরে দৌড়াইতেছেন। তিরিশ শতাংশের ভোট কুড়াইবার জন্য 'তোষণের রাজনীতি' দাওয়াইতে যে মসনদে বসা যাইবে না—এই অঙ্কই তাহাদের রামের আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছে। 'রাম কি কাহারও একার?'—এই উক্তি যথার্থ। হাজার হাজার বছর ধরিয়া শ্রীরামচন্দ্র ভারতবাসীর অনুপ্রেরণার উৎস। শ্রীরাম ভারতাত্মা, ভারতের রাষ্ট্রীয় পুরুষ। অযোধ্যায় রামমন্দির পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা তাই জাতীয় স্মারক রক্ষারই দ্যোতক। তাই শ্রীরামের আদর্শে অনুপ্রাণিত সব উদ্যোগে অংশগ্রহণ জাতীয় কর্তব্য। ইহা কাহারও একার হইতে পারে না। ভোট রাজনীতির কারণে এতদিন যাহারা এই উদ্যোগ হইতে দূরে সরিয়া ছিল এবং ওই একই কারণে যাহারা এখন এইসব উদ্যোগে শামিল হইয়াছে, তাহারা এখন রামের মহিমা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে।

শ্রীরামচন্দ্রকে এতদিন যাহারা 'মিথ' বলিয়াছে, অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করিয়াছে, বাবরি কাঠামো ধ্বংসের পর যাহারা মড়াকান্না কাঁদিয়াছে, তাহারা এখন বুঝিতেছে, জাতীয় ভাবাবেগকে আঘাত করিলে তাহার পরিণাম কী হইতে পারে। বস্তুত Emotional Attachment বা ভাবাবেগ জাতীয় সত্তার মূলগত উপাদান। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিতে গিয়া যাহারা ইহা বিস্মৃত হইবেন, তাহাদের কড়ায়-গণ্ডায় ইহার মূল্য চুকাইতে হইবে। ইহা পাপ। আর পাপ বাপকেও ছাড়িয়া কথা বলে না।

শ্রীরামনবমী শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যের কয়েকটি স্থানে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু কথা হইল, এইসব শোভাযাত্রার সুরক্ষার দায়িত্ব তো প্রশাসনেরই। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রাস্তায় নামিয়াছিল। শাসকদলের তোষণনীতির জন্য এই রাজ্যে সিমি আলকায়েদা, রোহিঙ্গা-সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাড়বাড়ন্ত হইয়াছে। রাজ্যের কয়েকটি এলাকা 'মিনি পাকিস্তান' হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গত কারণেই রাজ্যের হিন্দুসমাজ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এই ধরনের উৎসবে ক্রমশ অধিকাধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করিতেছে। আর অস্ত্র লইয়া শোভাযাত্রা তো এই দেশে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা হিন্দুদের ধর্মীয় রীতিরই এক অঙ্গ। অস্ত্রের ঝনঝনার মধ্যেই গীতার বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্রই পূজিত। কেবল ভোটরাজনীতির জন্যই বিষয়টি লইয়া হইচই করা হইতেছে। ঘটনা যাহাই হউক শ্রীরামনবমীকে কেন্দ্র করিয়া জনতার এই জাগরণ—অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির নৈতিক জয়। জয় শ্রীরাম।

সুভাষিতম্

জিহ্বাগ্রে বসতে লক্ষ্মী জিহ্বাগ্রে মিত্রবান্ধবাঃ।

জিহ্বাগ্রে বন্ধনঞ্চাপি জিহ্বাগ্রে বন্ধুরধ্রুবম্।। (চাণক্যনীতি)

জিহ্বার অগ্রভাগেই লক্ষ্মী বাস করে, জিহ্বার গুণেই মিত্র ও বন্ধু লাভ হয়। জিহ্বার গুণে মানুষের সঙ্গে বন্ধন হয় আবার জিহ্বার দোষেই বন্ধুত্বের বিনাশ হয়।

রাজ্য জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল রামনবমী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারা পশ্চিমবঙ্গে সাড়ম্বরে পালিত হলো রামনবমী। প্রতিটি জেলার প্রতিটি মহকুমায়, ব্লকে-ব্লকে, গ্রামে শহরে সর্বত্র দেখা গেছে রামভক্তদের শোভাযাত্রা। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে কেঁপে উঠেছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ। কোথাও অস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা দেখা গেছে, আবার কোথাও অস্ত্র ছাড়াই। বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কার্যক্রম তো ছিলই। প্রবল জনমতের চাপকে উপেক্ষা করতে না পেরে তৃণমূল কংগ্রেসও এগিয়ে এসেছিল রামনবমী পালন করতে। পিছিয়ে ছিল না যাদবপুর- প্রেসিডেন্সি প্রভাবিত কলকাতাও। এদিন কলকাতায় মোট ছ'টি শোভাযাত্রা বেরোয়। যার মধ্যে সব থেকে বড়ো ছিল উত্তর কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চলের মিছিলটি। পশ্চিম মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত একটি শোভাযাত্রায় হাঁটা রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন,

আহত পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা বলে দিচ্ছে তারা ধীরে ধীরে রামরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'আমি নিজে খড়্গপুরের মিছিলে হেঁটেছি। যারা আগে রামনবমীর শোভাযাত্রায় হাঁটা পছন্দ করত না, এখন করে। আমি নিশ্চিত অযোধ্যায় রামমন্দিরও তৈরি হবে।' বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় কার্যকর্তা সুরেন্দ্র জৈন বলেন, পশ্চিমবঙ্গে মোট ৭০০টি শোভাযাত্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ অংশ নেন। তার জন্য তিনি রাজ্যের বাঙালি হিন্দুদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান তোষণ এবং হিন্দুদের ওপর অত্যাচার যদি অবিলম্বে বন্ধ করা না হয় তাহলে ভবিষ্যতে হিন্দুরা আরও বেশি সংখ্যায় রাস্তায় নামবে। তৃণমূলের মদতে মুসলমান জঙ্গিদের তাণ্ডবে এদিন কিছুটা রামনবমীর উৎসব ব্যাহত হয়। রানিগঞ্জের শোভাযাত্রায় ভেতর ঢুকে একজনকে হত্যা করে। রানিগঞ্জে তাদের ছোড়া বোমায় মারাত্মক আহত হন পুলিশের পদস্থ আধিকারিক অরিন্দম দত্ত চৌধুরী। বিজেপির শোভাযাত্রায় কোনওরকম অশান্তির ইঙ্গিত না থাকা সত্ত্বেও দিলীপ ঘোষ এবং লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নামে মমতার নির্দেশে মামলা করেছে পুলিশ। অথচ যাঁর উস্কানিতে দাঙ্গা বাঁধল সেই অর্জুন সিংহের নামে কোনও এফআইআর করা হয়নি। এরফলে ক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন নিয়ে বাংলা ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি ভারতীয় মনীষীদের মূর্তি কলুষিত করা, ভেঙে ফেলাকে ঘিরে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে তারই প্রেক্ষিতে পরিচালক মিলন ভৌমিকের দাঙ্গা ছবিটি মানুষের মনে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে। পরিচালক ভারত ইতিহাসের এক অত্যন্ত ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অধ্যায়ের নায়ক, শিক্ষাবিদ ও জননেতা ড. শ্যামাপ্রসাদের জীবন ও সময় নির্ভর 'দাঙ্গা' নামে যে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন তা শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে। বেশ কয়েক বছর আগে নির্মিত হলেও ছবিটি সঙ্গত কারণেই এখনও প্রাসঙ্গিক। মিলনবাবু এই সূত্রে বলেন, ঐতিহাসিক পটভূমিতে ভারত ইতিহাসের যে সত্য এতদিন গোপন করা হয়েছে তাঁর ছবিতে সেই দিকটিই উন্মোচিত হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের মানুষজনকে সঠিক ইতিহাস বোধে শিক্ষিত করে তুলতে ১৯৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ও সত্য ইতিহাস এই ছবিতে বিধৃত হয়েছে বলে চলচ্চিত্রকারের দাবি। আগামী ৪ এপ্রিল সদ্য বিজেপি শাসনে আসা ত্রিপুরার আগরতলায় ছবিটি দেখানো হবে। এর পরই ৮ ও ১০ এপ্রিলে যথাক্রমে গুয়াহাটি ও কলকাতায় এর শুভ মুক্তি ঘটবে।

সরকারি ভাবে বিজেপি দল এই প্রদর্শনের ব্যবস্থা না করলেও পরিচালকের বয়ান অনুযায়ী দলের কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ত্রিপুরার রাজ্যপাল প্রথম প্রদর্শনীতে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। প্রসঙ্গত ছবিটি নানা বিতর্কে জড়িয়ে দীর্ঘ দিন সেন্সর বোর্ডে অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। পরিচালক বলেন, সম্প্রতি শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি কলঙ্কিত হওয়ার পর নতুন করে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা জনমানসে আলোড়ন তোলে। বিজেপি নেতাদের অনেকেই নাকি নিজেদের চেষ্টায় ছবিটি দেখতে উৎসাহী বলে জানা যাচ্ছে। ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের মধ্যে অন্যতম বলে জানান পরিচালক। বিজেপির অন্যতম জাতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা বলেন, "মানুষের আজ জানার সময় এসেছে ৪৬-এর সেই কুখ্যাত দাঙ্গার সময় ঠিক কী ঘটেছিল"। এই সূত্রে ত্রিপুরার রাজ্যপালের বক্তব্যেও ছিল চড়া সুর। তিনি বলেন, 'আমাদের একটা সহজাত অভ্যাসই হচ্ছে ইতিহাসকে গোপন করা। কিন্তু সত্যের উন্মোচন একান্ত জরুরি। সত্য ইতিহাস না জানলে একই ভুল আবার ঘটে যেতে পারে।'

তিন তালাকের পর আদালতের নজরে বহুগামিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মুসলমানদের বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা তিন তালাক বা তালাক-ই-বিদ্দতকে অবৈধ অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পর সর্বোচ্চ আদালত এবার বহুগামিতা এবং শরিয়ত আইনে অনুমোদিত কয়েকটি বিবাহ পদ্ধতির সাংবিধানিক বৈধতা বিচারের কাজ শুরু করেছে। আপাতত বিষয়টি দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চকে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র, এ.এম খানউইলকর এবং ডি. ওয়াই চন্দ্রচূড়কে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ মেনে নিয়েছে যে, এইসব বিবাহপদ্ধতি কতটা বৈধ তা সংবিধান প্রদত্ত সাম্যের অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে যদি দেখা যায় এইসব বিবাহপদ্ধতি অসাংবিধানিক তা হলে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যায় কিনা সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে মুসলিম পারসোনাল ল' (শরিয়ত) অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট, ১৯৩৭-এর ২নং ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে আবেদন করা হয়। এই ধারায় মুসলমানদের তিনটি বিবাহপদ্ধতি নিকাহ্ হালালা, নিকাহ্ মুতাহ্ এবং নিকাহ্ মাইসিয়ারকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। তিন তালাক নিয়ে মামলা চলার সময়েই মুসলমানদের নানান বিবাহ পদ্ধতি এবং বহুগামিতার বিষয়টি আদালতের নজরে আসে। আদালত পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সম্প্রতি।

সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ অ্যাডভোকেট ভি মোহন পরাশরণ, ভি শেখর সজন পুভায়া এবং আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণন জানান আদালত তিন তালাককে অবৈধ ঘোষণা করলেও মুসলমান সমাজে প্রচলিত (এবং ইতিমধ্যেই বিতর্কিত) কিছু রীতিনীতির প্রতি সেভাবে নজর দেয়নি। এই প্রসঙ্গে তারা নিকাহ্ হালালা, নিকাহ্ মুতাহ্ এবং নিকাহ্ মাইসিয়ারের উল্লেখ করেন এবং অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য আদালতকে অনুরোধ করেন।

কোনও মুসলমান মহিলা বিবাহ-বিচ্ছেদের পর যদি তার পুরনো বৈবাহিক সম্পর্কে ফিরে যেতে চান তাহলে তাঁকে দ্বিতীয় আর একজনকে বিয়ে করতে হয়। তারপর এই দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে কিছুদিন সুখে শান্তিতে ঘর করার পর এবং তার সন্তানের মা হবার পর বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি মেলে। এবং ওই মহিলা তাঁর প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যান। এই পদ্ধতিকে বলে নিকাহ্ হালালা। নিকাহ্ মুতাহ্কে শখের বিয়ে বলা যেতে পারে। এই বিবাহ ক্ষণস্থায়ী। পাত্রপাত্রী কতদিন একসঙ্গে থাকবেন আগে থাকতেই তা ঠিক করা থাকে। তারা যদি তাতে সম্মত হন তবেই এই বিবাহ সম্ভব। দু'জনের মধ্যে লিখিত চুক্তি হয়। স্বামীর সম্পত্তি বা উপার্জনে স্ত্রীর কোনও অধিকার থাকে না। আর একটি বিবাহপদ্ধতি হলো নিকাহ্ মাইসিয়ার। এও অনেকটা নিকাহ্ মুতার মতোই। একসঙ্গে থাকার সময় আগে থেকেই নির্দিষ্ট। তবে এই পদ্ধতিতে বিয়ে হলে স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার থাকে।

একাধিক সংগঠন এইসব অমানবিক বিবাহ পদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেকদিন ধরেই সরব। তাদের অভিযোগ মুসলমান সমাজে মেয়েদের জীবন অনেকটাই যৌনদাসিদের মতো। মুসলমান মহিলাদের অধিকাংশই নিরক্ষর নয়তো অর্ধশিক্ষিত। যার ফলে তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা মুসলমান পুরুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আদালতের সিদ্ধান্তে মুসলমান মহিলারা খুশি। তাদের আশা এবার সুবিচার পাওয়া যাবে।

কোরাপুটে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম কুখ্যাত চার মহিলা মাওবাদী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২৬ মার্চ ওড়িশার কোরাপুট জেলায় মাওবাদী দমন অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। কোরাপুট জেলার নারায়ণপটনা থানা এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে কুখ্যাত চারজন মহিলা মাওবাদী। এছাড়াও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছে একজন মাওবাদী। ঊর্ধ্বতন এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় কোরাপুট জেলার নারায়ণপটনা থানার অন্তর্গত ডোকারিঘাঁটি জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে ১৫-২০ জন মাওবাদী। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রবিবার গভীর রাতে ডোকারিঘাঁটি জঙ্গলে যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায় কোরাপুট জেলা ভলান্টারি ফোর্স (ডিভিএফ) এবং স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ। রাতের অন্ধকারে তল্লাশি অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে অতর্কিতে গুলি চালায় লুকিয়ে থাকা মাওবাদীরা। কালবিলম্ব না করে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। অভিযান শেষে নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে কুখ্যাত চার মহিলা মাওবাদী। এছাড়াও গুলিবিদ্ধ হয়েছে একজন মাওবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে সাতটি আগ্নেয়াস্ত্র। গোটা এলাকা ঘিরে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী।

নমো অ্যাপে তথ্য ফাঁসের অভিযোগ কং-সভাপতির

কেমব্রিজ অ্যানালেটিকা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর প্রয়াস : বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দিল্লির রাজনৈতিক মহলে একটা কথা খুব চলে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী প্রায়শই নানা বিষয়ে অভিযোগ করেন কিন্তু তার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ দেন না। এমনকী তাঁর কথাবার্তায় যুক্তির অভাবও লক্ষ্য করা যায়। কিছুদিন আগে 'লাল ডায়েরি' নিয়ে তিনি হৈচৈ শুরু করেছিলেন। আদালতের ধমক খেয়ে চেপে যান। সম্প্রতি তিনি এরকমই একটা অভিযোগ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামাঙ্কিত নমো অ্যাপে সংগৃহীত সাধারণ মানুষের তথ্য আমেরিকার কোনও এক সংস্থার কাছে ফাঁস করে দেওয়া হচ্ছে। বলাবাহুল্য এবারও কংগ্রেস সভাপতি অভিযোগের স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ দেননি। রাহুলের এই অভিযোগের কড়া জবাব দিয়েছে বিজেপি। এক টুইট বার্তায় দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কেমব্রিজ অ্যানালেটিকা কাণ্ড থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার জন্যই রাহুলের

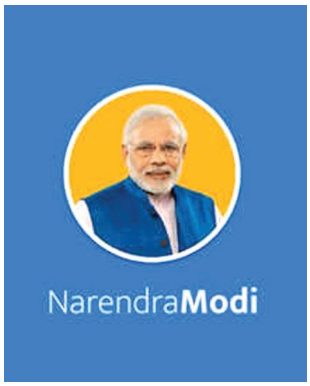

এই অভিযোগ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই রাজনৈতিক তথ্য বিশ্লেষণের নামে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য কেমব্রিজ অ্যানালেটিকা নামক এক মার্কিন সংস্থার কাছে পাচার করা হচ্ছে বলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল বিজেপি। উদ্দেশ্য, ২০১৯-এর নির্বাচনে জেতা। নমো অ্যাপের মাধ্যমে তথ্য ফাঁসের অভিযোগ সম্বন্ধে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'নরেন্দ্র মোদীর নামাঙ্কিত অ্যাপটি সবদিক থেকেই সুরক্ষিত। অন্যান্য অ্যাপে যে সুবিধে পাওয়া যায় না তা এখানে যায়। একজন ব্যবহারকারী নিজের নাম নথিভুক্ত না করেও অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে কোনও তথ্য না দিয়েও একজন গেস্ট ইউজার হিসেবে অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন।' দলের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, 'রাহুল গান্ধীর মিথ্যে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানাতে চাই নমো অ্যাপে তথ্য চাওয়া হয় শুধুমাত্র ডেটা অ্যানালেটিকের কারণে। গুগল অ্যানালেটিকও একই পদ্ধতিতে কাজ করে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কংগ্রেসের একটি মোবাইল অ্যাপের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের একটি কোম্পানির রহস্যজনক সম্পর্ক রয়েছে বলে বিজেপি অভিযোগ করায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি অ্যাপটি গুগল প্লেস্টোর থেকে মুছে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে রাহুল গান্ধীর কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

দেশের ২৫টি উচ্চ-আদালতে ন্যায়ের ঘড়ি বাজতে শুরু করবে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ২৪টি উচ্চ আদালতে প্রত্যহ কত সংখ্যক মামলার নিষ্পত্তি হলো আর কতই বা বাকি রয়ে গেল দৈনন্দিন ভিত্তিতে তা আদালত জানানোর জন্য আদালত চত্বরে ন্যায় ঘড়ি লাগানো হবে। এই ন্যায় ঘড়ির আওয়াজের মাধ্যমে নাগরিকদের তা জানানো হবে। একই সঙ্গে আদালতগুলির কাজকর্মের ভিত্তিতে পারস্পরিক অবস্থানও নিয়মমাফিক নির্ধারিত হতে থাকবে ও দিন প্রকাশিত হবে। জনগণের মধ্যে আদালতের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া ও উৎসাহ বাড়াতে এবং আদালতের কাজকর্মে প্রতিযোগিতা গতি ফেরাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে খবর। পরবর্তীকালে দেশের সমস্ত নিম্ন আদালতেই এই প্রক্রিয়া লাগু হওয়ার কথা।

গত বছরই এই ন্যায় ঘড়ি চালু করার প্রথম পরিকল্পনা নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যাতে করে দেশের প্রতিটি উচ্চ আদালতের কাজকর্ম সম্পর্কে দৈনন্দিন ধারণা পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে মামলার নিষ্পত্তি ও দ্রুততার ভিত্তিতে তাদের স্থান নির্ধারণ করে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করাই ছিল উদ্দেশ্য।

সরকার ইলেক্ট্রনিক লেড ডিসপ্লে মেসেজ বোর্ডের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া শুরু করবে বলে লোকসভায় জানিয়েছেন উপ-আইনমন্ত্রী পি পি চৌধুরী। এই ন্যায়-ঘড়ির একটি মডেল আইন মন্ত্রকের অন্তর্গত ন্যায়বিচার বিভাগের দিল্লির জয়শলমীর হাউসে গত বছর পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম লাগানো হয়। এই ঘড়িটিতে নাগরিকদের পক্ষে সরাসরি প্রাপ্য কিছু সুযোগ সুবিধের কথা উল্লেখ করা ছাড়াও জেলা ও মহকুমা আদালতগুলির মধ্যে কারা সর্বাধিক সংখ্যক দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা মামলার নিষ্পত্তি করতে পারল কিংবা কোন মামলা ২ বছর বা ৫ বছর কেউ বা ১০ বছর আটকে আছে তার হদিশ দেওয়া হয়েছিল। এই সাফল্যের ফলস্বরূপ গত ২০ ফেব্রুয়ারি সর্বোচ্চ আদালতের এই সংক্রান্ত 'ই-কমিটি' ২৪টি আদালতে ন্যায় ঘণ্টা বাজাবার অনুমোদন দিয়েছে।

ডোকলামে ভারত সজাগ এবং সতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'ডোকলামে পরিস্থিতি যেমনই হোক ভারত তার মোকাবিলায় সজাগ এবং প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।' সম্প্রতি একথা বলেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তাঁর এই মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আগামী জুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চীন সফরে যাচ্ছেন। চীনের কিংডাও শহরে অনুষ্ঠিতব্য (৯-১০ জুন) সাংহাই কোপারেশন অর্গানাইজেশন সামিটে তিনি যোগ দেবেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান ডোকলামে যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ভারত তৈরি। তিনি বলেন, 'ডোকলামে পরিস্থিতি যত অস্বাভাবিকই হোক ভারত তার মোকাবিলায় তৈরি। আমরা সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। যে-কোনও মূল্যে আমরা ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করব।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে গত ২১ ফেব্রুয়ারি সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াতের মুখেও একই কথা শোনা গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ডোকলামে সেনা মোতায়েন করা নিয়ে চিন্তিত হবার কোনও কারণ নেই। যে-কোনও আগ্রাসন রুখে দেবার জন্য ভারত তৈরি। চীনের লাল ফৌজ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ৭৩ দিন ধরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার পর চীন সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। ভারতের ওপর সামরিক চাপ বাড়ানোর জন্য যে-রাস্তা তারা তৈরি করছিল তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

উবাচ

"যারা মরা মরা করত, আজ তারা রাম রাম করছে। আগামী দিনে তারাই মোদী মোদী বলবে।"

তৃণমূলের রামনবমীর মিছিল প্রসঙ্গে

কৈলাশ বিজয়বর্গীয়
বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

"খুব দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠছে ভারতীয় অর্থনীতি। এই গতি বজায় থাকলে ২০২৫-এর মধ্যে ভারত ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশ হবে।"

গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন সামিটের বক্তব্যে

সুভাষচন্দ্র গর্গ
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের সচিব

"পাক-প্রেমে যারা হাবুডুবু খাচ্ছে, শাস্তি দিয়ে তাদের পাকপ্রেম ভুলিয়ে দিতে হবে।"

ঢাকায় এক আলোচনা সভায় বক্তব্যে

শেখ হাসিনা
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

"শাসকদলের তোষণনীতির জন্য রাজ্যে সিমি, আলকায়েদা, রোহিঙ্গা-সহ বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। তাই হিন্দুসমাজ অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে এ ধরনের উৎসবে শামিল হচ্ছে।"

রামনবমীর শোভাযাত্রা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপির সভাপতি

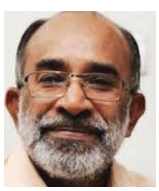

"আধার নিয়ে গুজবে কান দেবেন না। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করে বলতে পারি, সব তথ্য সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে। তথ্য ফাঁসের খবর মিথ্যে ও কাল্পনিক।"

তথ্য ফাঁসের অপপ্রচার প্রসঙ্গে

কে জে আলফনস
কেন্দ্রীয় ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

কলকাতায় সরযূ নদীর ধারে হবে রামমন্দির

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুপ্রিমো, তৃণমূল কংগ্রেস
দিদি,

দিলীপ ঘোষ হাসছেন। দিল্লিতে বসে হয়তো হাসছেন নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহও। এ হাসি প্রশান্তির।

বাংলায় নির্বাচনী লড়াইয়ে জেতার ক্ষমতা এখনও তৈরি না হলেও, অন্য খেলার ফার্স্ট রাউন্ডে কিন্তু দিদি আপনাকে হারিয়ে দিলেন গেরুয়া শিবিরের কর্তারা। সম্মোহনী শক্তির টানেই গেরুয়া শিবিরের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলল তৃণমূল কংগ্রেস। পূর্ণ হলো ষোলোকলা।

গত বছর রাজ্য জুড়ে রামনবমীর মিছিল করে অনেককেই অবাক করে দিয়েছিল হিন্দুশক্তি। আগেও অনেক শোভাযাত্রা হয়েছে কিন্তু ২০১৭ সালে সেই শোভাযাত্রাকে আলোর বৃত্তে নিয়ে এসেছিল শাসকদলই। আবার শক্তি দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল শাসকদল ও প্রশাসন।

তার পরেই নিজের রাজনৈতিক ভাষণেও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন আপনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বার্তা দিয়েছিলেন রাম কারও একার সম্পত্তি নয়। তাঁরাও হিন্দু দেবদেবীর পুজো করেন। ঠিক যেমন তিনি ইদ-বড়দিনে অংশ নেন। তিনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি বরদাস্ত করবেন না। ইত্যাদি, প্রভৃতি।

এর পরে নকল করা শুরু করেন আপনি। ভুল হলেও পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে মন্ত্র পাঠ থেকে ফেসবুকে হিন্দু উৎসবে পোস্ট করা শুরু করেন। গত এক বছরে কিন্তু ধীরে ধীরে কাকে বলে ধর্ম-রাজনীতি দেখিয়েছেন দিদি আপনি। মুসলমান তোষণের জন্য আপনি বিশ্বখ্যাত, কিন্তু হিন্দু মনজয়ের জন্য আপনার বকধার্মিকতার কুর্নিশ করতেই হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস পুরোহিতদের নিয়ে সম্মেলন করেছে জেলায় জেলায়। বজরংবলীর পুজো করেছেন তৃণমূলের নেতারা। কখনও মুখ্যমন্ত্রী প্রথমবার লোকনাথবাবার অনুষ্ঠানে গেছেন, আবার কখনও সপার্ষদ কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দিয়েছেন।

এবার সেই চক্রের ষোলোকলা পূর্ণ হলো। তৃণমূল এবার কোনও ভাবেই বিজেপিকে ফাঁকা মাঠ ছেড়ে দেবে না বলে আগেই ঘোষণা করেছিল। তৃণমূলও রাজ্য জুড়ে ঘটা করে রামনবমী পালন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। আপনার মন্ত্রী হাজি ফিরহাদ হাকিমও কপালে চন্দনের তিলক এঁকে রামগান করেছেন। আহাঃ! দেখে চোখে জল চলে আসে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, এতে প্রশ্ন উঠতেই পারে। গণেশ পুজো যদি পাড়ায় পাড়ায় হতে পারে, তাহলে রামনবমী ঘটা করে উদযাপন করায় দোষের কী রয়েছে?

রাম কারও একার নয়। কিন্তু দিদি এবার কি আপনি অযোধ্যায় রামমন্দিরের দাবি তুলবেন? আচ্ছা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দাবিতে কমপক্ষে চুপ করে থাকবেন কি! নাকি, কলকাতাতেই একটা রামমন্দির করে দেবেন রাজারহাটে।

সেটাই ভাল হবে দিদি। আপনি চাইলে কী না হয়! লোকসভা ভোটের আগে 'রাম'-এর পেটেন্ট নিয়ে নিন। নামকরণে আপনি তো সব সময়ে এক্সপার্ট। রাজারহাটের একটা জায়গার নাম দিয়ে দিন অযোধ্যা। সামনে খাল কেটে নাম হোক সরযূ নদী। পাশেই ভব্য মন্দির। ভোট কে আটকায় দিদি!

হেব্বি হবে। পর্যটনে পয়সাও আসবে। কিন্তু নকল ভক্তের মন্দির কি আসল বলে মান্যতা পাবে!

—সুন্দর মৌলিক

রাজ্যসভায় বিজেপির বিপুল জয়, গোরক্ষপুর-ফুলপুরের হারের মধুর প্রতিশোধ

রাজ্যসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপির ১১টি আসন বাড়লেও উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ, সংসদের এই উচ্চকক্ষে এখনও বিজেপির একক গরিষ্ঠতা নেই। এমনকী এনডিএ-র জয়ী সাংসদদের সঙ্গে নিয়ে গুনলেও গরিষ্ঠতা নেই। তাই নিম্নকক্ষে অর্থাৎ লোকসভায় পাশ হওয়া সরকারি বিল রাজ্যসভায় খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েই গেল। এখন রাজ্যসভায় বিজেপির আসন হলো ৬৯। এর সঙ্গে এনডিএ শরিকদের আসন যোগ করলে দাঁড়াবে ৮৮টি আসন। সেখানে বিজেপির বিরোধী দলের সদস্যদের আছে ১৫৮টি আসন। কংগ্রেস-সহ ইউপিএ-র সদস্য আছেন ৫৬। কংগ্রেসের এবার সদস্য আছেন ৫০ জন। রাজ্যসভার মোট আসন ২৪৫টি। এর মধ্যে ২৩৩ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ১২ জন মনোনীত সদস্য। সম্প্রতি রাজ্যসভায় বিজেপির ১৭ জন সদস্যের আসন শূন্য হয়। সেখানে এবার ভোটে বিজেপি-২৮টি আসনে জয়ী হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি বিজেপির বড় সাফল্য। তবে রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে অনেকটা দূরেই বিজেপির অবস্থান। অন্যদিকে, কংগ্রেসের ১৪ জন সদস্য অবসর নিয়েছেন। তাঁদের শূন্য আসনে ১০ জন কংগ্রেস প্রার্থী জিতেছেন। বাকি কংগ্রেসের চারটি শূন্য আসন গেছে বিজেপির ঝুলিতে। সহজ হিসেবে বিজেপির সদস্য সংখ্যা ৫৮ থেকে একলাফে বেড়ে ৬৯ হয়েছে। আর কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ১৪ থেকে কমে ১০ হলো।

রাজ্যসভার শূন্য আসনের নির্বাচনে বিজেপির সত্যিকারের যেটা লাভ তা হলো কংগ্রেস এবং অখিলেশের সমাজবাদী পার্টির আসন কমানো। কারণ, রাজ্যসভায় এই দুই পার্টির সদস্যরা বিজেপি বিরোধিতায় সর্বদাই সরব থাকে। সমাজবাদী পার্টির ছয়জন সদস্য রাজসভা থেকে অবসর নিয়েছেন। সপার এই ছয়টি শূন্য আসনে জিতেছেন মাত্র একজন সপা প্রার্থী। এটাই বড় সাফল্য। কারণ,

গূঢ়পুরুষের কলম

উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর- ফুলপুরের উপনির্বাচনে মায়াবতী এবং অখিলেশ 'বুয়া-ভাতিজার জোট' করে বিজেপিকে হারাবার পর মমতা বন্দোপাধ্যায় যেভাবে উল্লসিত হয়ে নাচানাচি করছিলেন সেখানে একটি জোর ঝটকা লেগেছে। তাই এখন বলছেন কংগ্রেসকে নিয়েই বিজেপি বিরোধী তৃতীয় ফ্রন্ট গড়তে হবে। কে প্রধানমন্ত্রী হবেন ভোটের পর তা ঠিক হবে। এ সেই রামায়ণের কালনেমির লঙ্কাভাগের গল্প। রাম-রাবণের যুদ্ধের আগেই কালনেমি ঠিক করে ফেলেন লঙ্কা রাজ্য কীভাবে ভাগ বাটোয়ারা হবে। বাস্তবে, সাত মন তেল পুড়বে, কিন্তু রাধা নাচবে না। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দেখলে করুণা হয়। ত্রিপুরায় সিপিএমের অপশাসন খতম করে বিজেপির জয়যাত্রা নিয়ে তাঁরা কলমের এক ফোঁটা কালি খরচ করেননি। কিন্তু গোরক্ষপুর-ফুলপুরের উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের আদতে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তায় যে ভাটার টান ধরেছে তা প্রমাণ করতে হাজার হাজার শব্দ খরচ করেছেন।

সবচেয়ে বিপদে পড়েছে বামেরা। বাঙালি কমিউনিস্টরা তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি বিরোধী জোটে যাবে না। কংগ্রেসের হাত ধরতে আগ্রহী। কেরল কমিউনিস্টরা আবার কংগ্রেসের ছোঁয়া লাগা জল পান করবেন না। তাঁরা কংগ্রেস এবং বিজেপি থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে একলা চলো নীতি নিয়ে চলতে চান। দলের মধ্যে এই খেয়োখেয়ি সিপিএমকে ভারতীয় রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে বিজেপি বিরোধী জোটে মমতা, মায়াবতী, অখিলেশ কেউই সিপিএমকে চায় না। বিশেষত, সীতারাম-কারাত বাগ্‌যুদ্ধের পর। দেশের কোনও রাজনৈতিক দলই কমিউনিস্টদের বিশ্বাস করে না। কারণ, তাঁরা কেউটে সাপের বাচ্চা। ১৯৭৯ সালে জরুরি অবস্থা জারির বিরোধিতায় মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস বিরোধী জোট কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে। সেই জোট সরকার স্থায়ী হয়নি। কারণ, মোরারজী সরকারের বিরুদ্ধে চরণ সিংহদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করেন বাম সাংসদরা। তারা পিছু থেকে ছুরি মারতে ওস্তাদ। গোটা দেশের মূল স্রোত থেকে বামেরা আজ বিচ্ছিন্ন। তারা আন্তর্জাতিক কমিনটার্নের শাখা হতে গিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট হতে পারেনি। বিজেপি যখন সংসদে নিজের অবস্থাকে মজবুত করতে দলের সভাপতি অমিত শাহকে রাজ্যসভায় আনছে তখন সিপিএম তার দলের কাণ্ডারি সীতারাম ইয়েচুরিকে সংসদ ছাড়া করছে। তাই বলছি, কমিউনিস্টদের কেউ বিশ্বাস করে না। করা উচিত নয়। কংগ্রেসের নেতা পাপ্পু, বুয়া, ভাতিজা, চটি পিসিরা সকলেই বিলক্ষণ জানেন যে দেশবৈরী কমিউনিস্টরা সুযোগ পেলেই পিঠে ছুরি মারবে। তাই তাঁরা আজ পর্যন্ত বিজেপি বিরোধী জোটে সামিল হতে ডাকেনি। ■

মধ্য প্রাচ্যে ইসলাম আর নিরঙ্কুশ নয়

সন্দীপ চক্রবর্তী

বেশিদিন আগেকার কথা নয়। ২০১৬-র সেপ্টেম্বর। ইরাকের উত্তরাংশে কুর্দিস্তান অঞ্চলের মানুষ এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হলেন। আরবিল শহরে এক বিশাল জরোস্ট্রিয়ান মন্দিরের উদ্বোধন হলো। এই মন্দিরের দেবতার যারা উপাসক সাধারণভাবে তারা 'জরদাসথি' নামে পরিচিত। এরা জরথুস্ট্রের অনুগামী। মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার বছর পর ওই অঞ্চলের প্রাচীন ধর্ম প্রত্যাবর্তন করল। এই জরোস্ট্রিয়ান ধর্মের উদ্ভাবক জরথুস্ট্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জরথুস্ট্র ছিলেন কুর্দিস্তানের মানুষ।

ইসলামের ধাত্রীভূমি হিসেবে যে দেশ পরিচিত সেই সৌদি আরবের সুলতান মহম্মদ বিন সলমনের কয়েকটি সিদ্ধান্তেও ইসলামিক বিশ্ব স্তম্ভিত। বিশেষ করে সৌদি আরবের সাবেকি চিন্তাভাবনার মানুষজন। সংস্কারমুখী কর্মোদ্যোগের একেবারে গোড়ায় আরবের সুলতান মেয়েদের ওপর বিধিনিষেধ অনেকাংশে শিথিল করেছিলেন। মেয়েরা গাড়ি চালাবার অনুমতি পেয়েছেন। সাধারণ বিনোদন কেন্দ্রগুলি লিঙ্গ-নির্বিশেষে সকলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। সারা বিশ্বে ইসলামের জিগির তুলে সাধারণ মুসলমানের মাথা খাওয়া ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের নেতারা ওইসব কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছেন।

গত কয়েকমাস ধরে ইরানেও বেশ কয়েকটি সরকার বিরোধী আন্দোলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এইসব আন্দোলনের গভীরতা এবং আগ্রাসন ২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট আহমেদিনেজাদের পুনর্নির্বাচন ঘিরে গড়ে ওঠা আন্দোলনের থেকেও বেশি। যদিও সাম্প্রতিক আন্দোলনগুলি দীর্ঘ অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সৃষ্ট। কিন্তু আন্দোলনকারীরা যেভাবে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আল খোমেইনিকে সর্বসমক্ষে গালিগালাজ করেছেন এবং যেভাবে ধর্মগুরুর ছবি লাগানো হোর্ডিং ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন তাতে ইসলামি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। ইরানের মানুষ এখন ১৯৭৯ সালের ইসলামিক গণজাগরণের বিরুদ্ধে সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তাদের বিষোদ্গারে ভরে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়াল।

ভারতেও আমরা এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। লক্ষাধিক মুসলমান মহিলা তিন তালাকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে তাদের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে এই পরিবর্তন যদি তার কাঙ্ক্ষিত পরিণতি লাভ করতে সমর্থ হয় তাহলে তা হবে মানব সভ্যতার সব থেকে স্বস্তিদায়ক ঘটনা।

প্রশ্ন হলো, কেন? কী এমন ঘটল যে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ হঠাৎ ইসলাম বিরোধী হয়ে উঠলেন? ইসলামের সংস্কার এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল? কয়েকটি বিষয় আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

কুর্দিশ জোরোস্ট্রিয়ান ধর্মের ঘুরে দাঁড়ানো

২০১৬-র সেপ্টেম্বর। ইরাকি কুর্দিস্তানের রাজধানী আরবিলে একটি বিশাল জরোস্ট্রিয়ান মন্দিরের উদ্বোধন হয়ে গেল। এই অঞ্চলে ইসলাম আসার আগে জরোস্ট্রিয়ান ধর্মই ছিল একমাত্র ধর্ম। আলেকজান্ডারের সামরিক অভিযান এবং ইসলামিক আগ্রাসনের পর এই অঞ্চলে ব্যাপক ধর্মান্তরণ শুরু হয়। পরবর্তীকালে পারস্য (অধুনা ইরান) যা ছিল জরোস্ট্রিয়ান বা জরথুস্ট্রের মতবাদে বিশ্বাসী দেশ, ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মাত্র কয়েক হাজার পারসি তাদের উপাস্য অগ্নিকে নিয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসে আশ্রয় নেন। আরও পরে ইসলামিক শাসকদের অকথ্য অত্যাচারে পারস্য এবং কুর্দিস্তানে জরোস্ট্রিয়ান ধর্ম ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

কুর্দরা কেন তাদের প্রাচীন ধর্মে ফিরতে চাইছে

কয়েক হাজার বছর ধরে কুর্দরা মূলত ইরান, সিরিয়া, তুর্কি এবং ইরাক—এই চারটি দেশে বসবাস করে আসছে। সারা বিশ্বে কুর্দরাই সম্ভবত সব থেকে প্রাচীন এবং

বৃহত্তম জনগোষ্ঠী যাদের নিজের কোনও জাতিসত্তা নেই। নিজস্ব জাতিসত্তার নির্মাণে তারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে।

পাশাপাশি ওই চারটি দেশেই চলছে কুর্দদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রাম গোড়ায় অহিংসই ছিল। কিন্তু এখন আর তা নয়। ইসলামিক শাসকদের অবর্ণনীয় অত্যাচার এবং নির্বিচার গণহত্যায় আন্দোলন সশস্ত্র হয়ে উঠেছে। কুর্দিশ সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন পি কে কে এবং ওয়াই পি জি দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রামে রত। তাদের সঙ্গে ইসলামিক প্রভুদের বহু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। হতাহত হয়েছে দু'পক্ষেরই অসংখ্য মানুষ।

ইসলামিক স্টেটের নিষ্ঠুরতা

২০১৪ সালটা সারা বিশ্বের ইতিহাসে দুঃস্বপ্নের বছর হিসেবে চিহ্নিত। এই বছরই ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেটের জন্ম হয়। সুন্নি মুসলমানদের নিয়ে গঠিত এই সংগঠনের লক্ষ্য ইরাক এবং সিরিয়ায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা। কুর্দরাও মুসলমান কিন্তু তারা বালুচদের মতো নরমপন্থী। কোনওভাবেই ওয়াহাবি বা অন্য কোনও জিহাদি গোষ্ঠীর মানসিকতা সম্পন্ন নয়। স্বাভাবিক ভাবেই কুর্দরা হয়ে উঠেছিল ইসলামিক স্টেট এবং তাদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের পথে সব থেকে বড়ো বাধা। যে কারণে ন্যাটো এবং আমেরিকার সমর্থনে গড়ে উঠেছিল পেশমার্গ ফাইটিং ইউনিটগুলি। এটা আজ ঐতিহাসিক সত্য, কুর্দ পেশমার্গ ফাইটাররা ইসলামিক স্টেটের যত ক্ষতি করেছে বিশ্বের কোনও সামরিক বাহিনী বা সংগঠন করতে পারেনি। বাগদাদির নেতৃত্বাধীন ইসলামিক স্টেটের জমানায় এই সামরিক সাফল্যের দামও দিতে হয়েছে সাধারণ কুর্দদের। যে অত্যাচার তাদের ওপর হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। কয়েক হাজার মেয়েকে যৌনদাসী বানানো থেকে শুরু করে গ্রাম-কে-গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, অবাধ লুঠতরাজ, নলি কেটে গণহত্যা, গণধর্ষণ...

ইসলামিক স্টেটের অত্যাচার ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তাই কুর্দ সমাজের প্রবীণ এবং যুব নেতারা বিকল্প পথের সন্ধান শুরু করলেন। এই সন্ধানেরই ফসল প্রাচীন জরোস্ট্রিয়ান ধর্ম বা অগ্নির উপাসনায় ফিরে যাবার ভাবনা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রোজাভা বিপ্লবের পরেই কুর্দদের নতুন যুগের সূচনা হয়। এই যুগেই কুর্দমহিলারা প্রথম লিঙ্গবৈষম্য থেকে মুক্ত এক পৃথিবীর সন্ধান পান। রোজাভা বিপ্লবের সেই স্বাধীনচেতা-অকুতোভয় কুর্দদের আমরা দেখতে পেলাম ইসলামিক স্টেট এবং পেশমার্গদের মধ্যে সংঘর্ষে। যেখানে পেশমার্গ (কুর্দ) মহিলারা পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে অসম সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছেন। সারা বিশ্ব তাদের কুর্নিশ করেছে।

সৌদি আরবের সুলতান মহম্মদ বিন সলমনের আমলে নারীর ক্ষমতায়ন

গত কয়েক মাস ধরে সৌদি আরব সারা বিশ্বের ইসলামিক ইতিহাসে অভিনব কিছু অধ্যায় লিখে চলেছে। সৌদি আরব এমন একটি দেশ যেখানে জঙ্গি মানসিকতা সম্পন্ন ওয়াহাবিতত্ত্ব দিনের আলো দেখেছিল। কালক্রমে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বকলমে আরব সাম্রাজ্যবাদের এই বিস্তারের প্রেক্ষাপটে ছিল কোটি কোটি পেট্রোডলার।

ওয়াহাবিদের ইতিহাস ২০০ বছরের পুরনো। কিন্তু ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামিক বিপ্লবের পর ওয়াহাবিরা মৌলবাদী এবং জঙ্গি মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। কারণ তথাকথিত ইসলামিক বিপ্লবের পর সৌদি আরবের একচেটিয়া আধিপত্য ধাক্কা খায়। একদিকে মুসলমান দেশগুলিতে নতুন ইরানি ইসলামিক সংস্করণের জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ভয় এবং আরবের ক্রমহ্রাসমান আধিপত্য— এই দুইয়ের প্রতিক্রিয়াতেই সৌদি আরব ওয়াহাবিদের জঙ্গি ইসলামের তত্ত্বকে ইসলামের একমাত্র ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করে। ইসলামের যাবতীয় আধুনিক সাংস্কৃতিক প্রতীক এবং বিনোদনের মাধ্যমগুলি অবলুপ্ত হয়। মেয়েদের প্রকাশ্য জনজীবনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হয়। ইসলামিক আইন ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কিনা দেখার জন্য আরবের রাস্তাঘাটে নীতিপুলিশের দল টহল দেওয়া শুরু করে। মেয়েদের মধ্যযুগীয় পর্দাপ্রথার আড়ালে বন্দি করে ফেলা হয়।

কিন্তু যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করল। তিনি সংস্কারের বন্যা বইয়ে দিলেন। মেয়েদের ওপর প্রযোজ্য সমস্ত অযৌক্তিক বিধিনিষেধ বর্জিত হলো। বাধ্যতামূলক সারা শরীর ঢাকা 'আবায়া' পোশাক পরিধান হয়ে উঠল ঐচ্ছিক। আরবে মেয়েরা এখন দোকান খুলতে পারেন। কোনও সঙ্গী ছাড়াই যে-কোনও ধরনের ব্যবসা করতে পারেন। পুরুষসঙ্গী ছাড়া প্রকাশ্য স্থানে যেতে পারেন। সিনেমা-থিয়েটার দেখা বা গাড়ি চালানোতেও কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।

মহম্মদ বিন সলমন ইসলামের সংস্কার করতে চাইছেন কেন?

সৌদি আরবের অর্থনীতি খনিজ পেট্রোলিয়াম-নির্ভর। পেট্রোলিয়ামের দাম দিন-দিন এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে বিকল্প জ্বালানির সন্ধান অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী যথার্থ বিকল্পের খোঁজ পাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। অর্থাৎ প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে পেট্রোলিয়াম তার গুরুত্ব অচিরেই হারিয়ে ফেলবে।

যেহেতু সৌদি আরব একটি মৌলবাদী ইসলামিক দেশ, মেয়েদের ওপর অযৌক্তিক বিধিনিষেধের কারণে দেশটি সৃজনশীল মানবসম্পদের ৫০ শতাংশ কাজে লাগাতে পারে না। অর্থনীতির এই সংকটে সৌদি আরব দেশের অর্ধেক মানবসম্পদ মধ্যযুগীয় তামাশার ঘেরাটোপে আর পঙ্গু করে রাখতে পারছে না। সেই কারণেই মহম্মদ বিন সলমন লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে চাইছেন। এবং অর্থনীতিতে গতি আনার জন্যই ইসলামের সংস্কারে ব্রতী হয়েছেন।

সারা বিশ্বের মুসলমান সৌদি আরবকে তাদের পিতৃভূমি মনে করেন। কারণ সেখানেই রয়েছে ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি তীর্থস্থান— মক্কা ও মদিনা। তাই সারা বিশ্বের মুসলমানের কাছে আরবের এই পরিবর্তিত সমাজভাবনা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই মনে করছেন, সৌদি আরব যদি বদলায় তা হলে অন্যান্য দেশের মুসলমানরাও নিজেদের বদলানোর কথা ভাববেন।

মৌলবাদী ইসলামের বিরুদ্ধে ইরানের উত্থান

২০১৭-র শেষে সমগ্র ইরান জুড়ে এক আশ্চর্য বিক্ষোভ দেখা গেল। সাম্প্রতিক অতীতে এত বড়ো এবং এত গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ইরানে দেখা যায়নি। মানুষ যদিও অর্থনৈতিক মন্দার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন, কিন্তু ইসলাম বিরোধিতার চোরাস্রোতও বয়ে যাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। অর্থনৈতিক স্লোগানের পাশাপাশি শোনা গেছে, 'মোল্লারা নিপাত থাক', ...'মোল্লাদের ফাঁসিতে ঝোলাও', 'পারস্যে ইসলামের কোনও স্থান নেই', 'ইসলামিক বিপ্লব ছিল আমাদের সব থেকে বড়ো ভুল' ইত্যাদি স্লোগানও। প্রতিবাদকারীরা আল খোমেইনির একটি হোর্ডিং ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালে ইসলামিক বিপ্লবের পর আল খোমেইনি হয়ে উঠেছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা। ঈশ্বরের পরেই ছিল তাঁর স্থান। কখনও কখনও প্রোফেট মহম্মদের থেকেও তিনি বেশি গুরুত্ব পেয়েছেন। কিন্তু এবার জনরোষ আছড়ে পড়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। যা দেখে বহু ইসলামি গবেষক বিস্মিত। মিডিয়াও বিভ্রান্ত। এরকম যে হতে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

আরব এবং পারসিক দ্বন্দ্ব

প্রতিবাদ সমাবেশে অল্পবয়েসি যুবকেরা চিৎকার করে বলছিলেন, 'আমরা আর্য। আরব দেবতাদের আমরা পছন্দ করি না।' আরব দেবতা মানে অবশ্যই ইসলাম। এই একটি কথায় ইরানি সমাজে আরবি এবং পারসিকদের সাংস্কৃতিক বিভাজনটি স্পষ্ট। আরবরা যাযাবর প্রজাতির লোক। মরুভূমিতে ভ্রাম্যমান একটি বিশেষ জনজাতি। অন্যদিকে পারসিকরা প্রাচীন জাতি। তাদের কয়েক হাজার বছরের পরম্পরা রয়েছে। পারসিকরা পৃথিবীর অন্যতম সুসভ্য, সুশিক্ষিত এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্যের স্রষ্টা। আরবরা যখন বর্বরের জীবনযাপন করছে তখনই পারসিকরা তাদের থেকে কয়েক কোটি গুণ এগিয়ে গেছে।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা যে আরব দেশীয়দের থেকে আলাদা— উচ্চতর শ্রেণীর, সেই বোধ পারসিকদের চিরকালই ছিল। সেই কারণেই তারা কোনওদিন সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, ভাষাগত বা সামাজিক ভাবে ইসলামের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। পবিত্রগ্রন্থ কোরান থেকে শুরু করে যা কিছু আরবের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছুই তার ব্যতিক্রম নয়।

কেন ইরানে ইসলাম বিপন্ন

প্রতীকী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক জীবনে অযৌক্তিক ও মধ্যযুগীয় বিধিনিষিধ, মেয়েদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো আচরণ ইত্যাদি সভ্য শিক্ষিত সুসংস্কৃত পারসিক সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। স্বাধীন চিন্তাভাবনায় অভ্যস্থ পারসিকদের কয়েক হাজার বছরের সাহিত্যিক, শৈল্পিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক উৎকর্ষের পরম্পরা রয়েছে। আরব হানাদারদের হাতে পর্যুদস্ত হবার আগে জরোস্ট্রিয়ান ছিল এখানকার প্রধান ধর্ম। অগ্নি ছিলেন উপাস্য দেবতা। ইরানের সমাজ-মননে সর্বস্ব হারানোর সেই যন্ত্রণা আজও রয়ে গেছে। তাই সমাজের বৃহত্তর অংশের আক্ষেপ— ইসলাম কবুল করা ভুল হয়েছিল। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আর্থ-সামাজিক নানা চ্যালেঞ্জ, পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও বাণিজ্যে পশ্চিমি দুনিয়ার বিধি নিষেধ, সিরিয়া ও ইরাকের যুদ্ধে ইরানের অংশগ্রহণ, ইয়েমেনের হাউদি জঙ্গিদের মদত দেওয়া। প্যান ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিস্তারে ইরানের অংশগ্রহণ সে দেশের সাধারণ মানুষের মানসিকতার পরিপন্থী। সেই কারণেই ইরান আজ ক্ষুব্ধ। ইসলামও সেখানে বিপন্ন।

ইসলামের শেষ কি আসন্ন?

এখনই এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু বললে সেটা অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। তবে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইরানের পরিস্থিতি এক অন্যরকম বাস্তবের দিকে ইঙ্গিত করছে। ইসলাম শৃঙ্খলাবদ্ধ উপসনাপদ্ধতি। এখনও পর্যন্ত বিশেষ কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়নি। ইসলাম সম্পর্কে যাঁরাই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদের নৃশংসভাবে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ততটা সহজ নয়। বহু মুসলমান ইসলামের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব বাড়াচ্ছেন। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, ইসলামের পিতৃভূমি আরবেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। পৃথিবী যত আধুনিক হচ্ছে মুসলমানরা তাদের মজহবের দিকে আঙুল তুলছেন। কেউ কেউ ফিরে যাচ্ছেন তাদের পিতৃ-পিতামহের ধর্মে। ইসলামি তরবারির ভয়ে যা হয়তো কয়েক শতাব্দী আগে অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

ভারতেও আমরা এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। লক্ষাধিক মুসলমান মহিলা তিন তালাকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে তাদের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে এই পরিবর্তন যদি তার কাঙ্ক্ষিত পরিণতি লাভ করতে সমর্থ হয় তাহলে তা হবে মানব সভ্যতার সব থেকে স্বস্তিদায়ক ঘটনা। ইসলামমুক্ত সেই পৃথিবী হবে যথার্থ শান্তির। ■

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দেবোত্তর ভূমির দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির বাংলাদেশ তথা অখণ্ড ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ধর্মীয় পীঠস্থান। এটি শুধু একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই নয়, একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবেও স্বীকৃত হয়েছে, যা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে অন্তর্ভুক্ত আছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি বড় অংশ মনে করেন ঢাকেশ্বরী দেবীর নাম থেকেই ঢাকার নামকরণ হয়েছে। আশ্চর্য হচ্ছে, এই ঐতিহাসিক মন্দিরের ২০ বিঘা দেবোত্তর ভূমির মধ্যে প্রায় ১৪ বিঘাই বেদখল হয়ে গেছে। দখল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের অব্যবহিত পর থেকে। স্বাধীন বাংলাদেশেও তা বন্ধ হয়নি। এখন বাদবাকি অংশ দখলেরও পাঁয়তারা চলছে। কয়েকদিন আগে এজন্য কয়েকজন চড়াও হয় মন্দিরে। ভক্তদের প্রতিরোধ ও পুলিশের হস্তক্ষেপে তা বানচাল হয়ে যায়। ঢাকেশ্বরীর দেবোত্তর ভূমি উদ্ধার করার জন্যে দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই আন্দোলন আরও বেগবান হয়েছে। এরই মধ্যে এই ঘটনা ঘটলো। তার প্রতিবাদে ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতীক অনশন করেছেন ভক্তরা। বিশিষ্ট মানবাধিকার নেত্রী সুলতানা কামাল অনশন ভঙ্গ করান। সর্বস্তরের মানুষ এই অনশনে যোগ দেন। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, শুধু ঢাকেশ্বরীর দখল নয়, সারাদেশেই মঠ-মন্দিরের দেবোত্তর ভূমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। দখল হচ্ছে শ্মশানও।

ঐতিহাসিক কেদারনাথ মজুমদার একটি প্রবাদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'ঢাকেশ্বরী দেবীর নাম হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে আদিশূর ও বল্লাল সেনের নাম যুক্ত করিয়া ঢাকা নামের প্রাচীনতা প্রতিপাদন করেন।' ১৯১০ সালে প্রকাশিত 'ঢাকার বিবরণ' গ্রন্থে তিনি এই প্রবাদের বর্ণনায় লিখেছেন, 'রাজা আদিশূর তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর ধর্মবিদ্বেষ ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বনবাসের ব্যবস্থা করেন। রানি এই অপমানে মর্মাহত হইয়া জীবন বিসর্জনের জন্য ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দেন। দেবরাজ ব্রহ্মপুত্র রানিকে সযত্নে রক্ষা করিয়া বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিতা ভগবতীর হস্তে প্রদান

বর্তমান মূল মন্দিরের গর্ভ-গৃহের সম্মুখভাগ

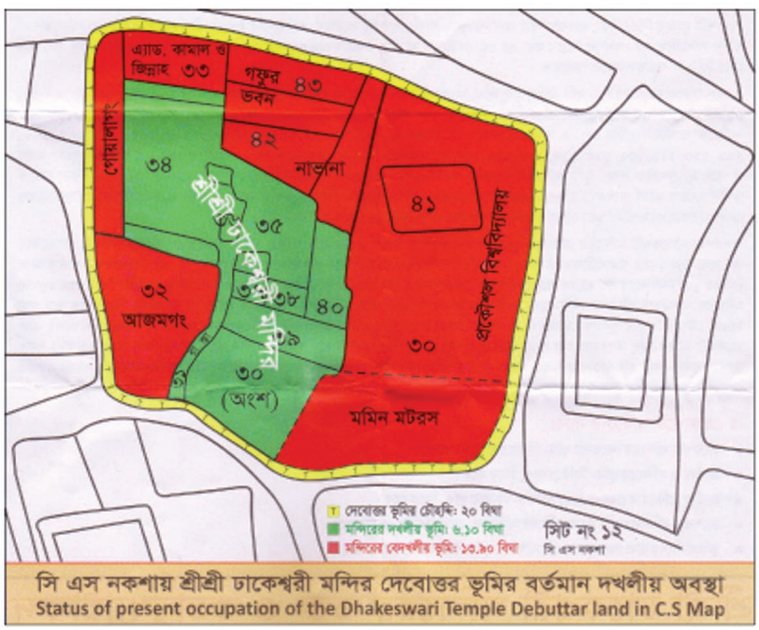

সি এস নকশায় শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী মন্দির দেবোত্তর ভূমির বর্তমান দখলীয় অবস্থা
Status of present occupation of the Dhakeswari Temple Debuttar land in C.S Map

করেন। সেই স্থানে রানির একটি পুত্র প্রসূত হয়। পুত্র দেবীর কৃপায় বর্ধিত হইতে থাকে। প্রবাদ— এই পুত্রই বল্লাল সেন। একদিন রাজকুমার ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নিবিড় অরণ্যে দেবীর মূর্তি দেখিতে পাইয়া সেই দেবীকেই রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন এবং দেবীকে ঢাকেশ্বরী দেবী নামে অভিহিত করিলেন। ক্রমে এই দেবীর নাম হইতেই ঢাকা নামের উৎপত্তি হইল।' এই কাহিনীকেই অন্য একটি মতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'রাজা বিজয় সেনের স্ত্রী নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্দে ব্রহ্মপুত্র নদে পবিত্র স্নান শেষে ফেরার পথে 'ঢাকা' বৃক্ষরাজির মধ্যে লুকায়িত দুর্গামূর্তি দেখতে পান। তিনি ভক্তিপ্রণত চিত্তে দুর্গার আরাধনা করেন এবং পুত্র সন্তান কামনা করেন। কালক্রমে তিনি পুত্র সন্তানের মা হন, সেই পুত্র ইতিহাসে বল্লাল সেন নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে সিংহাসনে আরোহণের পর জঙ্গলাকীর্ণ জন্মস্থানকে স্মরণীয় করে রাখতে তিনি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিরাট উৎসবের মধ্য দিয়ে এখানে মন্দির নির্মাণ করেন এবং দুর্গাদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'ঢাক' বৃক্ষরাজির মধ্যে পাওয়া যায় বলে দেবীমূর্তির নাম হয় ঢাকেশ্বরী। পরে ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়। ঢাকেশ্বরী থেকে।' 'ঐতিহাসিক যতীন্দ্রমোহন রায় রচিত 'ঢাকার ইতিহাস' ও শিশির কুমার বসাক রচিত 'ঢাকা নগরীর ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সতীর কিরীটের জিল্লাদার ঢাক এই স্থানে পতিত হয়। শিশির কুমার বসাক আরও বলেছেন, ঢাক নামক রত্ন দিয়ে সতীর মস্তকভূষণ নির্মিত হয়েছিল। 'প্রচলিত প্রবাদ এই যে, সতীর কিরীটের ঢাক এই স্থানে পতিত হওয়ায় এই স্থান একটি উপপীঠ হিসেবে গণ্য হয়। ঢাক পতিত হওয়াতেই এই স্থানের নাম ঢাকা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঢাকেশ্বরী নামে সুপরিচিত হইয়াছে।' পাওয়া তথ্যে বলা হয়েছে, দশম শতাব্দীর কোনও এক সময় নির্মিত ঢাকেশ্বরী মন্দির কয়েকবার সংস্কার করা হয়। সর্বশেষ আঠারো শতকে এই মন্দির ভেঙে পড়ার উপক্রম হলে ঢাকার নায়েবে আমির সংস্কার করেন। বিশ শতকের প্রথম দশকে ভাওয়াল পরগনার রাজা এই মন্দির আবার সংস্কার করেন এবং স্থায়ী পরিচর্যার জন্যে প্রায় কুড়ি বিঘা সম্পত্তি এই মন্দিরের দেবোত্তর হিসেবে উৎসর্গ করেন। মন্দির পরিচালনার জন্যে ভাওয়ালের রাজা আটজন ব্রাহ্মণের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করেন। এরাই পরে সেবায়েত হন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্যতম সেবায়েত প্রহ্লাদমোহন তেওয়ারি ও হরিহর চক্রবর্তী ঢাকেশ্বরী বিগ্রহ নিয়ে ভারতে চলে যান। তারা কলকাতার শোভাবাজারের কুমারটুলিতে নতুন মন্দির নির্মাণ করে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য সেবায়েতদের মধ্যে ছিলেন প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্তীর ছেলে হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, রমনা কালীমন্দিরের পূজারী পরমানন্দ গিরি, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের পূজারী নরসিংহবন গোস্বামী, সিদ্ধেশ্বরীর হরিপ্রসাদ লালা, ফরিদপুরের মধুসূদন চক্রবর্তী ও বসন্তলাল চৌবে। মূল দায়িত্ব এসে পড়ে হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর ওপর। তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে নতুন বিগ্রহ প্রতিস্থাপন করেন, নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সেবাপূজা চালিয়ে যান।

ঢাকেশ্বরীর জায়গা-জমি দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয় মূলত ১৯৫০ সালে। তখন কার্যত কোনও সংগঠিত প্রতিবাদ হয়নি, প্রতিবাদের পরিবেশও ছিল না। তখন সাম্প্রদায়িক হামলার মুখে দেশত্যাগ চলছে। ঢাকেশ্বরীর তৎকালীন সেবায়েত সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানান, প্রতিবাদপত্র পাঠান তথাকথিত মাইনোরিটি বোর্ডের কাছে। মাইনোরিটি বোর্ড সরকারের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলেও দখল প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি। ঢাকেশ্বরীর দেবোত্তর ভূমির এক বিরাট অংশ গ্রাস করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। দখলদারদের মধ্যে আছে মুসলমান ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠান। ভক্ত ও নেতৃবৃন্দের অভিযোগ, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এভাবে একটি ঐতিহাসিক মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি ধারাবাহিকভাবে বেদখল হতে পারে না। এখন বাদবাকি দেবোত্তর ভূমি দখলের চেষ্টা চলছে। একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর দুবার ঢাকেশ্বরী মন্দির আক্রান্ত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর ২৫ নভেম্বর রাতে একটি গাড়িতে সেনাবাহিনীর পোশাক পরা কয়েকজন ব্যক্তি এসে অস্ত্র উঁচিয়ে ঢাকেশ্বরীর মূর্তি তুলে নিয়ে যায়। আবার ভারতে ঢাকেশ্বরী মূর্তি নতুন করে গড়ে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ১৯৯০ সালে রামমন্দিরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং দেবীমূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়। ফের স্থাপন করা হয় নতুন মূর্তি।

বছর দেড়েক আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশ সফরে এলে তিনি ঢাকেশ্বরী মন্দিরে এসে পুজো দেন। এই প্রথম বার ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আসেন। এ সময় নেতৃবৃন্দ ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি জরবদখলের কথা তাঁকে জানান। বিদেশ থেকে বিশিষ্ট জনেরা বাংলাদেশ সফরে এলে তাঁরাও ঢাকেশ্বরী মন্দির দেখতে আসেন। গত বছর দুর্গাপূজার সময় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতি বছরই দুর্গাপূজার সময় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আসেন। অথচ ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দেবোত্তর ভূমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠতেই বাংলাদেশ আওয়ামি লিগেরই অঙ্গ সংগঠন আওয়ামি ওলামা লিগ কয়েকদিন আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে অভিযোগ করেছে, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের আশেপাশের মুসলমানদের জমি মন্দির কমিটি ও হিন্দুরা দখল করতে চাইছে। ওলামা লিগ একটি সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে। এতে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে হিন্দু সমাজ। ■

মানুষ সমর্থন করবেন নরেন্দ্র মোদীকেই

অমিতাভ সেন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার ভক্তপ্রবর বলরাম বসুকে কথা দিয়েছিলেন— তোমার বাড়ি যাব। উৎসবের দিনে রানি রাসমণির জামাই সেজবাবুর সঙ্গে অন্যত্র চলে যাওয়ায় বাগবাজারের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। রাত্রে শয়নের পর তাঁর বলরামের কথা মনে পড়ে। ধড়ফড় করে শয্যা থেকে উঠে সেজবাবুর ঘরে এসে বলেন—'এই রাত্তিরেই আমাকে বাগবাজার যেতে হবে, না হলে সত্য রক্ষা হবে না।' গাড়ির ব্যবস্থা হলো। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর থেকে বাগবাজারে এলেন। বলরাম বসুর বাড়িতে গভীর রাত্রে সকলে শুয়ে পড়েছে। ঠাকুরের একান্ত অনুরোধে দারোয়ান সিংহ দরোজা খুলে দিল। চৌকাঠ পার হয়ে ঠাকুর বলরাম বসুর বাড়িতে ঢুকলেন। মাটিতে তিনবার পা ঠুকে বললেন,— 'এই এনু, এই এনু, এই এনু; এই গেনু।' কারোর ঘুমের ব্যাঘাত না করে ঠাকুর আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। সত্যরক্ষা করার এটা এক অনুপম উদাহরণ।

নীতিশাস্ত্রের ভাষায় একেই বলে— You should be seen to follow the Truth– যা রাষ্ট্রবাদী শক্তি সর্বদা করে থাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি বরাবরই সত্যের সঙ্গে গঠবন্ধন করে এসেছে। দেশমাতৃকাকে পরম বৈভবশালিনী করাই একমাত্র ধ্যেয় লক্ষ্য। ২০১৪ সালে এমন বহুদল এনডিএ-তে যোগ দিয়েছিল যারা অটলজীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালের পর ইউপিএ-১ ও ইউপিএ-২-তে নৌকা ভিড়িয়ে ছিল। ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে সকল সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনা, ডি-মানিটাইজেশন, জিএসটি, কঠোর টাইম বাউন্ড ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি অনুশাসনের প্রাবল্যে কয়েকজন এনডিএ-পার্টনার হাসফাঁস করছিলেন। ল্যুটিয়েন দিল্লির একশ্রেণীর সাংবাদিক এতদিন সেবা দিয়ে এসেছেন। তারাও এখন নর্থ ব্লকে ঢুকতে পান না। কাজেই রেস্ত নেই। আবাল্যের সত্যপন্থী স্বয়ংসেবক মোদীজী লাগিয়ে দিলেন দুর্নীতির কাঁথায় আগুন।

রিফরমার যোগীজীকেও উত্তরপ্রদেশে অনেক দাম চোকাতে হচ্ছে। অ্যাকাডেমিক ও

চাকরির পরীক্ষায় গণটোকাটুকি বন্ধ। টুকে পাশ করে একশ্রেণীর ছেলে চাকরি গুছিয়ে নিতো। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে এক টোকা-হড়কানো স্কুল শিক্ষক এলিফ্যান্ট শব্দের মানে বলেছে ছুঁচো। (তৃণমূলি জমানায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি অনার্সের ছাত্র পরীক্ষায় পেয়েছে বিগ-জিরো)। রোমিওদের ছুঁচোবাজি, মাসলম্যানদের তোলাবাজি, অফিসবাবুদের ফাঁকিবাজি সব বন্ধ। জমি মাফিয়ারা মাটির নীচে সেঁধিয়ে গেছে। অন্নদাতা কৃষক যাঁরা ডবলডিজিট জিডিপি দেন তাঁদের ঋণ মকুব করা হয়েছে। ১৭-১৮ বর্ষে চাল ও গম ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয় সম্পূর্ণ হয়েছে। দাম প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেছে, খাপচি করার কোনও উপায় নেই। ভারতে বছরে মোট ২৩ লক্ষ টন ডাল ও মশলা প্রয়োজন হয়, কিন্তু এতদিন উৎপাদন হতো বছরে ১৮ লক্ষ টন। ডালের দর এক সময় ২০০ টাকা কেজি হয়েছিল। আজ আখের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডাল উৎপন্ন হচ্ছে ৩৫ দিনে। ১৬-১৭ বর্ষে ২৯ লক্ষ টন বাজারে এসেছে এবং উদ্বৃত্ত রপ্তানি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে একটাও দাঙ্গা হয়নি, শান্তি বহাল হয়েছে। এজন্যে শিল্পে ১০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো কাল্পনিক বিনিয়োগ নয়। গত ৫ বছরে এত গল্প শোনা গেল, কিন্তু মদের দোকান ছাড়া বাংলায় রাজস্ব আদায়ের কোনও উপায় নেই। টাটা চেয়ারম্যানের চূড়ান্ত হেনস্তার পর কোনও শিল্পপতি পশ্চিমবঙ্গে পা রাখতে চাইছেন না। বিনিয়োগ হচ্ছে বিজেপি শাসিত প্রদেশগুলোতে।

বিরোধীরা এক নতুন ব-কচ্ছপ মার্কা থিয়োরি আবিষ্কার করেছে, 'গ্রোথ উইদাউট এমপ্লয়মেন্ট'। কংগ্রেস জমানায় জিডিপি ছিল ২ শতাংশ যেটা আজ বেড়ে হয়েছে ৭.৫ শতাংশ— যা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবুও ভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে অর্থনৈতিক গ্রোথ হলেও চাকরি হচ্ছে না। প্রতিদিন ২২ কিলোমিটার হাইওয়ে, ১৫ কিলোমিটার রেলওয়ে তৈরি হচ্ছে। নমামি গঙ্গে প্রকল্পে ৪৮টি প্রজেক্ট সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি ১০১টি এ বছরে সম্পূর্ণ হবে। এসব কাজে অসংখ্য শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। রিয়েল এস্টেটের সব কোম্পানি নথিভুক্ত হয়েছে। ডি-মানিটাইজেশনের পর ইনফরমাল ইকোনমি ফরমাল হয়েছে। ই.এস.আই ইপিএফ-এ ১ কোটির বেশি শ্রমিক নথিভুক্ত হয়েছেন। আই আই এম-এর হিসেব মতো সার্ভিস সেক্টরে প্রতি ১ হাজার কোটি বিনিয়োগে ১ লক্ষ মানুষের কাজের সংস্থান হয়। অন্যদিকে, শ্রীহরিকোটায় একসঙ্গে ১০৪টি স্পুটনিক অন্তরীক্ষে পাঠানো হয়েছে। এই প্রজেক্টে অনেক মধ্য এবং উচ্চশিক্ষিত যুবক কাজ পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় সাড়ে চার লক্ষ কোটি বিনা কোলাট্যারাল গ্যারেন্টিতে লোন নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন ১০ কোটি যুবক প্রযুক্তিবিদ। তারা এমন হাইকোয়ালিটি যন্ত্রাংশ তৈরি করছেন যে ডিফেন্স ইমপোর্ট ১৭ শতাংশ কমে এসেছে। ৪ কোটি গ্রামীণ মহিলা ফ্রি গ্যাস কানেকশন পেয়েছেন। তারা বলছেন— আমাদের গৃহস্থালী রান্না শেষ হচ্ছে আধ ঘণ্টায়, আরও তিন ঘণ্টা উপার্জনের কাজে লাগাতে পারছি। কৃষকঘরণীর বরহস্তস্পর্শে এবং কৃষকের শ্রম দানে ১৬-১৭ বর্ষে ২৭৭ ট্রিলিয়ান টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে একটা সঙ্গত পরিমাণ রপ্তানি করা হয়েছে। সরকারের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ রেকর্ড ছুঁয়েছে। এত বিরাট উদ্যোগের পেছনে কোনও শ্রম বিনিয়োগ নেই এবং উপার্জন নেই, একথা যারা বলেন তাঁদের বিদ্যাশিক্ষা ঘোড়ার দ্বিতীয় পাতা বা টিনটিন কমিক্স পর্যন্ত— এটা মানতেই হবে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

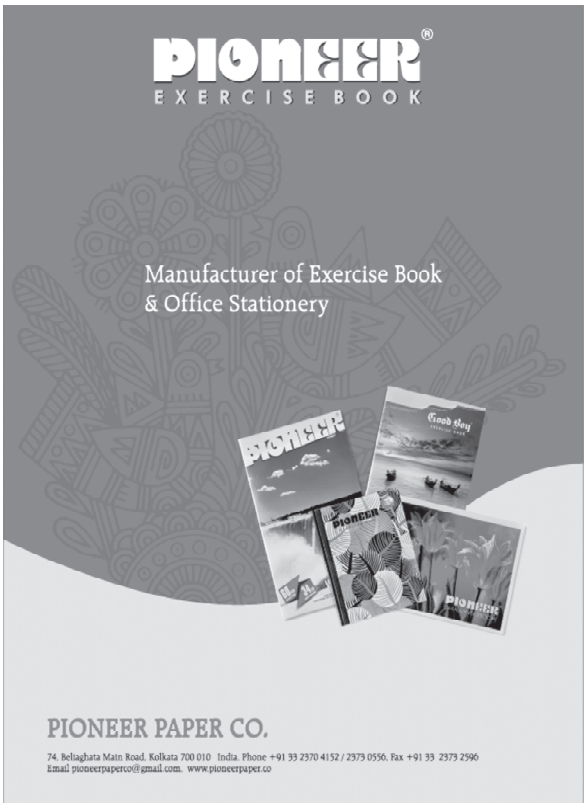

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

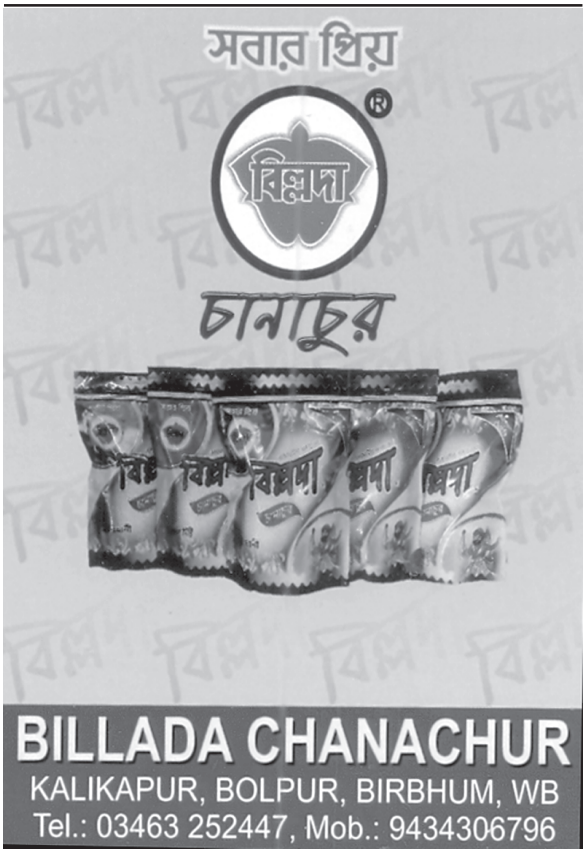

জোটের রাজনীতি না রাজনীতির জোট

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ

গণতন্ত্রের ধারা দেশে বিভিন্ন ভাবে প্রবাহিত হলেও তারমধ্যে একটি মূলভাব অভিন্নরূপে উপস্থিত থাকে। প্রথমত, গণতন্ত্রের বয়স ৫০ বছর পূর্ণ হলে রাজনীতি সাধারণভাবে দুটি মূল ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটিকে Center-to-right বা সাধারণভাবে দক্ষিণপন্থা ঘেঁষা ধারা, অন্যটি Center-to-left বা সাধারণত বামপন্থা ঘেঁষা ধারা বলা যেতে পারে। মধ্যপন্থী রাজনীতি মূলত উভয় শক্তির মধ্যে বিরাজমান থাকে। মিশ্রিতভাবে তাই দুটিকেই বিশ্লেষণ করার সময় একটি মধ্যপন্থার থেকে দক্ষিণমুখী ও অন্যটিকে মধ্যপন্থার থেকে বামমুখী ধারা বলে লোকমুখে পরিচিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের রাজনীতি One party dominated party system অর্থাৎ একদলীয় প্রাধান্য যুক্ত বহু দলীয় ব্যবস্থা বলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত পরিচিত ছিল। যখন কংগ্রেসকে মূল ও প্রধান দল হিসাবে ধরা হতো এবং অন্যান্য দলগুলি কংগ্রেসের তুলনায় ছিল অত্যন্ত ছোট বা মাঝারি। এরফলে জরুরি অবস্থা-পরবর্তী সময় জনতা পার্টির সৃষ্টি হয়, যে দল কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত দলের এক মহামিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ও ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা উত্তরকালে কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসি সরকার ১৯৭৭ সালে গঠিত হয়।

জনতা পার্টির সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বা হতে দেওয়া হয়নি। ফলত, জনতা পার্টিও দীর্ঘকাল ভারতের রাজনীতি প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু যে মূল বিতর্ক জনতা পার্টির বিভাজনকে নিশ্চিত করেছিল তা হল, যাঁরা জনসঙ্ঘী ছিলেন না তাঁরা জনসঙ্ঘীদের আর এস এসের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ককে কটাক্ষ করতে লাগলেন ও আপত্তি তুললেন। তখন জনসঙ্ঘ থেকে যাঁরা জনতা পার্টি তে গিয়েছিলেন তাঁরা জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয় জনতা পার্টি নামে আত্মপ্রকাশ করলেন। আর এস এসের সঙ্গে ভারতীয় জনসঙ্ঘের যেমন সুসম্পর্ক ছিল ভারতীয় জনতা পার্টিও সেরূপ আর এস এসের সঙ্গে নিবিড় ও দৃঢ় সম্পর্ক রেখে এগিয়ে চলতে লাগল। কালের নিয়মে ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেসের প্রতিস্পর্ধী শক্তিরূপে ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থান হলো। ১৯৭৭-১৯৯৭ পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং অকংগ্রেস ও অবিজেপি দলগুলির সমন্বয়— এই তিনটি ধারাই প্রবাহিত ছিল। কিন্তু কালেকালে যখন বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি হলো ও তাঁর মিত্রশক্তিরা বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে যোগদান করলেন, স্বাভাবিক নিয়মেই কংগ্রেসের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে এমন শক্তিগুলি ইউপিএ-র

অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। যাঁরা এনডিএ ও ইউপিএ-এর বাইরে রইলেন তাঁরা বিভিন্ন সময় যখন যেমন সুবিধে কখনও বিজেপি বা কখনও কংগ্রেস সবার সঙ্গেই ঘর করেছেন এ ইতিহাস রয়েছে।

এরমধ্যে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি, বামপন্থী অন্যান্য দল, সমাজবাদী পার্টি ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল কোনওদিনই বিজেপির সঙ্গে জোটে আসেনি। আবার মিলিতভাবে এরা এমন শক্তিও নয় যারা কেন্দ্রে অকংগ্রেস বা অবিজেপি সরকার দিতে পারবে। এঁরা মূলত কখনও প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও অপ্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-কেই সাহায্য করেছে। অর্থাৎ কংগ্রেস বিরোধী ভোটকে কৌশলে ভেঙে আসন জিতে আবার কংগ্রেসের সঙ্গে আপাত দূরত্ব রেখে কংগ্রেসকেই ভিতর থেকে সমর্থন ও সাহায্য জুগিয়েছে।

আজ ভারতের রাজনীতিতে তৃতীয় বিকল্প বলতে কী বুঝি? যে সকল রাজ্যে কংগ্রেস বা বিজেপি কেউ-ই ক্ষমতায় নেই, যেমন— (১) পশ্চিমবঙ্গ, এখানে ৪২টি আসন আছে লোকসভায়। (২) ওড়িশা, রাজ্যের ২১টি আসন আছে লোকসভায়। (৩) অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা, মিলিতভাবে এদের ৪২টি আসন আছে লোকসভায়। এছাড়া এ আই এ ডি এম কে শাসিত তামিলনাড়ুকে ধরছি না, কারণ তাঁদের সঙ্গে বিজেপির সখ্য ও ডিএমকে-র সঙ্গে কংগ্রেসের নিবিড় সম্পর্কের কথা সকলেরই জানা আছে। ফলে অকংগ্রেস ও অবিজেপি শাসিত রাজ্যে সর্বমোট যেকটি লোকসভার আসন আছে তাহলো ৪২+২১+৪২=১০৫টি আসন। লোকসভার মোট আসন ৫৪৪। অর্থাৎ ৫৪৪ এর মধ্যে ১০৫ আসন এখন তথাকথিত অকংগ্রেস ও অবিজেপি শাসিত রাজ্যে। এর সঙ্গে কেরলের ২০টি বামমোর্চা শাসিত আসনও যদি ধরে নিই তবে দাঁড়ায় ১২৫ যা সমগ্র লোকসভা আসনের মাত্র ২২.৯ শতাংশের আশেপাশে। এবার এই রাজ্যগুলির ভিতরে রাজনীতির দিকে নজর রাখি। সিপিএম নেতৃত্বাধীন এলডিএফ শাসিত কেরল ও টিএমসি শাসিত পশ্চিমবঙ্গ যদি একই জোটে যায় ভোটারা সে পাটিগণিত কীভাবে মেনে নেবে? এই পাটিগণিত দেখে কংগ্রেস ও সিপিএম একসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা লড়েছিল মানুষ তাঁদের গ্রহণ করেনি।

এবার ধরা যাক, উত্তরপ্রদেশ। এখানে ৮০টি আসন রয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। ভারতের সর্ববৃহৎ রাজ্য লোকসভার আসনের নিরিখে। বিজেপি বিরোধীদের পরীক্ষাগার। আশা কী? এসপি-বিএসপি-কংগ্রেস মহাজোট, যেমন বিহারে সব বিজেপি বিরোধী মূল দলগুলিকে এক করা হয়েছিল? তেমন ভাবে? অভিজ্ঞতা কী বলে? এসপি-বিএসপি জোট আগেও হয়েছিল দু-বছর টেকেনি। যেমন বিহারের মহাজোট দু-বছরও চলেনি। গেস্ট হাউস কাণ্ড মায়াবতী ভুলতে পারবেন তো? বিজেপি ৫০ শতাংশ ভোট

আসন প্রতি সংগঠিত করতে নামবে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা গেরুয়া দল বসে বসে এই জোট হবে সেটা দেখবে কি? অখিলেশ-মুলায়ম-শিবপালের যা সম্পর্ক জোট হলে ঘর এক থাকবে তো? উত্তরপ্রদেশ-বিহারে ৮০+৪০=১২০ আসনের মধ্যে আসন প্রতি সমীক্ষা শুরু হয়েছে। বিজেপি ও গেরুয়া বাহিনীর ভোট যে সকল আসনে ৪৫ শতাংশের উপরে সেখানে সামাজিক সমীকরণ দৃঢ় করে ৫০ শতাংশের ওপর তাকে নিয়ে যাবার পথে নেমে পড়া হয়েছে। সমগ্র সঙ্ঘ পরিবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঐক্যবদ্ধভাবে এই জাতপাতের মহাজোটকে আটকাতে বদ্ধপরিকর। বিহারে মহাজোটের সম্ভাবনা নেই, কারণ জেডি(ইউ)- বিজেপি একসঙ্গেই লড়বে।

এবার বিজেপি বিরোধীদের দ্বিতীয় অঙ্ক, মহারাষ্ট্র। শিবসেনার সঙ্গে অম্লমধুর সম্পর্কের ফলে আসন সমঝোতা হবে না বলে শোনা যাচ্ছে। এ বিষয় অতীত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বিজেপি-শিবসেনা আসন রফা হলে কংগ্রেস-এনসিপি আসন রফা হয় আর বিজেপি, শিবসেনা আলাদা লড়লে কংগ্রেস এনসিপি-ও আলাদা লড়ে। এছাড়া একথা সমস্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষক জানেন শিবসেনা গেরুয়া বাহিনীর বাইরের শক্তি নয়। বিজেপিকে এতো অবিবেচক ভাবার কোনও কারণ নেই যে, বিজেপি রাজনৈতিক পর্যালোচনা না করেই নামবে। শিবসেনার সঙ্গে সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়াও চলছে সেটা জেনে রাখা ভালো।

এখন বিজেপির জয়কে ছোট ও হারকে বড়ো করে দেখানোর প্রবল চেষ্টা চলছে। ২০১৪-র পর ৮টি উপনির্বাচনে পরাজিত হওয়াই যদি নির্ণায়ক হয় তবে ১১টি বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপির জেতা ও ৫টি বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র জেতাকে ছোট করা হবে কেন। ৮টি উপনির্বাচন যদি সব হয় তাহলে ১৬টি বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলি, যে রাজ্যগুলি বিজেপি ২০১৪-র পর জিতেছে, যেখানে প্রায় ২৫৭টি লোকসভা আসন রয়েছে সে অঙ্ককে অবহেলা করা হবে কেন? কারণ বিজেপি বিরোধী হওয়া তুলতে হবে। একটা আবেগ সৃষ্টি করতে হবে যে বিজেপি হেরে যাবে যাতে বিজেপির দিকে আসা জনস্রোতকে আটকানো যায়। উপনির্বাচনের পরাজয়ের ফলে শাপে বর হবে। বিজেপি গা-ঝেড়ে উঠতে শিখবে ঘর গুছিয়ে। ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ হেরে যাবে বলে যাঁরা ভাবছেন তাঁরা সুখস্বপ্ন দেখছেন। ২০১৯-এ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ নিরঙ্কুশসংখ্যা গরিষ্ঠ হবে এবং ২০১৪-কে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে।

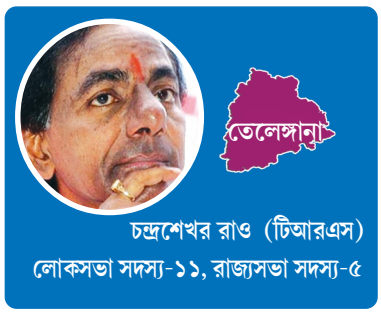

শতাংশ হিসেবে ভোট প্রাপ্তি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। স্বাধীনতার পর মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়েছে ভেবেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের গরিমা গায়ে মেখে ভোটে দাঁড়ানোর লোভ

কংগ্রেস সামলাতে পারেনি। তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ৪৪ শতাংশ অর্থাৎ ৫০ শতাংশের নীচে ভোট পেয়ে সরকার গড়েছিলেন। তাই দিবারাত্র যাঁরা বিজেপি-র ভোট শতাংশ নিয়ে গভীর আলোচনারত তাঁরা দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনে কেন্দ্রে কবে কংগ্রেস ৫০ শতাংশের উপরে ভোট পেয়েছিল জানাবেন কি? কোনওদিনও পায়নি।

এছাড়াও রয়েছে বিশ্লেষকদের বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ যে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় বিজেপি যা ভোট পেয়েছে এসপি এবং বিএসপি মিলিতভাবে তার বেশি ভোট পেয়েছে। তাদের কি হিসেবে এও আছে, অটলবিহারী বাজপেয়ী বেশি ভোট পেয়েছিলেন। অর্থাৎ ২০০৮-এর এনডিএ বেশি ভোট পেয়ে হেরেছিল ও ইউপিএ কমভোট পেয়ে জিতেছিল। এ হিসেবে সম্ভব হয় কারণ যদি ভোটের ভিত্তি অল্প জায়গায় ঘন হয়। আসন জেতা সহজ হয়। কিন্তু যদি ভোটের ভিত্তি বিশাল জায়গা জুড়ে হয় ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে হয় তখন আসন পাওয়া কঠিন হয়। সেটা সকলের ক্ষেত্রেই সমান সত্যি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কের ভিত্তিতে ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের নিরিখে যদি ধরা যায় এখনি ভোট হয় তবে বিজেপি আগের ফলাফল মোটের উপর ধরে রাখতে পারবে। তামিলনাড়ুতে রজনীকান্তের কথাবার্তা বুঝিয়ে দিচ্ছে এ আই এ ডি এম কে-রজনীকান্ত এঁরা এনডিএ-র সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলবে। মায়াবতী সাধারণত উপনির্বাচনে প্রার্থী দেন না, তবে সাধারণ নির্বাচনে আসন-সমবোঝা হওয়া এসপির সঙ্গে বিএসপি-র সহজ ব্যাপার নয়। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় রাজ্যের ভোট ও সাধারণ নির্বাচন গায়ে গায়ে। ফলে আলাদা-আলাদাও হতে পারে আবার এক সঙ্গেও হতে পারে। যখন সরকার নীতিগত ভাবে একসঙ্গে লোকসভার ও রাজ্য বিধানসভার ভোট করতে ইচ্ছুক। তাই অঞ্চল ভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পশ্চিমভারতে অর্থাৎ গুজরাট, রাজস্থান, গোয়াতে সরাসরি লড়াই কংগ্রেস বিজেপির। মহারাষ্ট্রের কথা আগেই বলেছি। মধ্যভারতের মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে সোজা লড়াই কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির। এই সকল রাজ্যে তৃতীয় ফ্রন্ট অস্তিত্বহীন। উত্তরভারতে হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশে বিজেপি-কংগ্রেস দ্বৈরথ। জম্মু-কাশ্মীরের চিত্র ভিন্ন, জম্মুতে ও লাদাখে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেস। কাশ্মীরে এন সি-এর সঙ্গে পিডিপি-র। উত্তরপ্রদেশের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুর কথা বলা হয়েছে। কেরলের রাজনীতি চিরকালই এলডিএফ এবং ইউডিএফ-এ বিভক্ত, তবে সেখানে বিজেপির ভোট বাড়বে ও ২৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। কর্ণাটকে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। লিঙ্গায়েতদের হিন্দুধর্ম বহির্ভূত এই ঘোষণা করে কংগ্রেস নিজেদের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিয়েছে। হিন্দু সমাজকে ভাগ করে ভোট জেতার পুরোনো ছকে নেমেছে কংগ্রেস। সেটা মানুষ বুঝছে। কংগ্রেসের থেকে মুখ্যমন্ত্রী কর্ণাটকে হবে না আর যাই হোক। তেলেঙ্গানায় সোজাসুজি লড়াই হবে বিজেপির সঙ্গে টি আর এস-এর। অন্ধ্রপ্রদেশে ত্রিমুখী লড়াই হবে টি ডি পি-ওয়াই এস আর কংগ্রেস ও বিজেপির। কংগ্রেস এখানে অতীত। কেন্দ্রের শাসককে অস্বীকার করে অন্ধ্রপ্রদেশে সরকার চালানো মুশকিল। উত্তরপূর্বাঞ্চল বিজেপির গড়। একমাত্র মিজোরাম ছাড়া সর্বত্র বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ ক্ষমতায়। এখানে সরাসরি লড়াই কংগ্রেসের সঙ্গে, তৃতীয় ফ্রন্ট বলে কিছু নেই এই অঞ্চলে। বিহার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বাকি রইল পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা। দুই রাজ্যেই শাসক দলের সঙ্গে সরাসরি লড়াই বিজেপির ফলে জোটের রাজনীতি চলছে কিন্তু এনডিএ, ইউসি-এর বাইরে তার অবকাশ অত্যন্ত সীমিত। ফলে রাজনীতি করার জন্যই রোজ জোটের গল্প। বাস্তবে তার ধার ভার দুই-ই কম। তবে গণতন্ত্রে চেষ্টা থাকবেই এবং সে চেষ্টার পিছনে আশাও থাকবে, কারণ কংগ্রেসকে বাইরে থেকে সমর্থন করতে বাধ্য করতে আঞ্চলিক দলগুলির এই ইচ্ছা বহু দিনের। কিন্তু পরিস্থিতি যেরূপ তাতে মানুষ অস্থিরতার পক্ষে রায় দেওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে ২০১৯-এর প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে নরেন্দ্রভাই মোদী অনেক এগিয়ে রয়েছেন। সেখানে প্রায় প্রাথমিক অবস্থায় আছে বিরোধী জোট। শোনা গেছে দিল্লিতে বিরোধী জোটের মিটিংয়ে গিয়েও তাঁরা বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে বিজেপির সঙ্গেও যোগাযোগ করে এসেছেন। পরিবার কেন্দ্রিক দলগুলি তাঁদের নীতি নির্ধারণ করে পরিবারের স্বার্থকে বজায় রেখে। ফলে পরিবার তুষ্ট হলেই মত বদলে যায়। যখন কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করে তখন বলে স্বৈরাচার আর যখন বিজেপির সঙ্গ ছাড়ে তখন বলে সাম্প্রদায়িক। একথা শুনতে শুনতে শিশুও বুঝে গেছে যে যাওয়া আসা স্রোতে ভাসাটা শুধুই স্বার্থের জন্য। তাই বিজেপি ও কংগ্রেস যে তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে তারা তার দিকে থাকবে। স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপির পক্ষে আঞ্চলিক দলগুলির স্বার্থ রক্ষা করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কারণ কংগ্রেসের আসন যে ১০০ পেরবে না সেটা সমস্ত বিশ্লেষকই ভালো ভাবে জানেন। কারণ সারাদেশে কংগ্রেস রয়েছে মাত্র তিনটি রাজ্যে কর্ণাটক, মিজোরাম ও পঞ্জাব যেখানে মিলিত আসন সংখ্যা লোকসভায় ৪৩ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের একার চেয়ে মাত্র একটি বেশি। অপরদিকে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র শাসনে রয়েছে ২১টি রাজ্য সরকার। যেখানে বড় বড় রাজ্য যেমন উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য রয়েছে। আশা সবপক্ষেরই থাকবে। গণতন্ত্রে আশা থাকায় খারাপ কিছু নেই। কিন্তু বাস্তব চিত্রটিতে সম্পূর্ণভাবে এখন পর্যন্ত এনডিএ এগিয়ে রয়েছে। এই কুরুক্ষেত্রে কে কৌরব আর কে পাণ্ডব তা রাজনীতির নেতাদের তর্কে স্থির হবে না। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ধর্ম যার সঙ্গ দেবে জয় সেখানেই স্থির হবে। যেথায় ধর্ম সেথায় কৃষ্ণ, যেথায় কৃষ্ণ সেথায় জয়।

রাহুল গান্ধী (কংগ্রেস)
লোকসভা সদস্য-৪৮, রাজ্যসভা সদস্য-৫১

মায়াবতী (বি এস পি)
লোকসভা সদস্য-০, রাজ্যসভা সদস্য-৪

আত্মসন্তুষ্টি ঝেড়ে ফেলতে হবে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের তিনটি লোকসভা এবং দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি মোটেই আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। বরং, ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে চোখ ধাঁধানো সাফল্যের পর এই উপনির্বাচনে বিজেপির ব্যর্থতা বেশ কিছুটা হতাশই করেছে বিজেপি কর্মীদের। যে কেন্দ্রগুলিতে এবার উপনির্বাচন হয়েছিল, সেগুলি হলো— উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর এবং ফুলপুর লোকসভা কেন্দ্র। বিহারের আরারিয়া লোকসভা কেন্দ্র এবং জেহানাবাদ এবং ভাবুয়া বিধানসভা কেন্দ্র। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি এবং মায়াবতীর বহুজন সমাজবাদী পার্টি এবার জোটবদ্ধ হয়ে লড়েছিল। গোরক্ষপুর এবং ফুলপুর— এই দুই কেন্দ্রেই এবার এই জোট বিজয়ী হয়েছে। এর মধ্যে ফুলপুর কেন্দ্রটি বরাবরই ওজনদার রাজনৈতিক নেতাদের লড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত। ১৯৫৭ এবং ৬২ সালে জওহরলাল নেহরু এই কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হন। ৬২ সালে এই কেন্দ্রেই জওহরলাল পরাজিত করেছিলেন সমাজবাদী রামমনোহর লোহিয়াকে। ১৯৬৪-তে জওহরলালের প্রয়াণের পর তাঁর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত একটি উপনির্বাচনে এখানে জেতেন। তিনি পরাজিত করেন সমাজবাদী নেতা জ্ঞানেশ্বর মিশ্রকে। কিন্তু এর পরের লোকসভা নির্বাচনেই জ্ঞানেশ্বর মিশ্র ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রীসভার সদস্য কে ডি মালব্যকে এই কেন্দ্রে হারিয়ে নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে এই কেন্দ্রে জেতেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ। কিন্তু এই কেন্দ্রে বরাবরই সমাজবাদীদের অনেকটাই প্রভাব ছিল। বিশ্বনাথ প্রতাপের পর এই কেন্দ্রটি সমাজবাদীদের দখলেই চলে যায়। ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রটি সমাজবাদীদের দখলেই ছিল। ২০১৪ সালে সমাজবাদী প্রার্থীকে হারিয়ে বিজেপির কেশবপ্রসাদ মৌর্য এই কেন্দ্রে জেতেন। সেদিক দিয়ে দেখলে বলা যায়, তাদের এই শক্তিশালী কেন্দ্রটি জোট করে সমাজবাদী পার্টি পুনরুদ্ধার করেছে।

বিহারের আরারিয়া কেন্দ্রটি বরাবরই লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী পার্টির দখলে। মুসলমান অধ্যুষিত এই অঞ্চলে বিজেপির কখনই খুব একটা আশা ছিল না। তদুপরি এই আরারিয়া কেন্দ্রে সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে এবার ভোট করেছে আর জে ডি। আর জে ডি জেতার পর এই কেন্দ্রেই স্লোগান ওঠে— পাকিস্তান জিন্দাবাদ। ভারত তেরি টুকরে হোঙ্গে। এইরকম একটি কেন্দ্রে বিজেপির পরাজয় তাই অবাক করে না। বিহারের দুটি বিধানসভা আসনের ভিতর জেহানাবাদ ছিল আর জে ডি-র দখলে, সেটি তারা দখলে রেখেছে। আর ভাবুয়া বিধানসভা কেন্দ্র ছিল বিজেপির দখলে। বিজেপিও সেটি দখলে রেখেছে। কাজেই বিহারে বিজেপি পর্যুদস্ত হয়েছে বলে যারা আনন্দ করছেন, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, বিহারে বিজেপি মোটেই পর্যুদস্ত হয়নি। বরং বিহার যেমন ছিল, তেমনটিই রয়েছে।

বরং, সত্যিই যদি কিছু হতাশ করে থাকে বিজেপিকে তা হলো— উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর এবং ফুলপুর লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল। গোরক্ষপুর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ছেড়ে আসা কেন্দ্র। আর ফুলপুর উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্যের ছেড়ে আসা কেন্দ্র। খোদ মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর ছেড়ে আসা নির্বাচনী কেন্দ্রে এমনভাবে বিজেপির পরাজিত হওয়া কখনই কাম্য নয়। এর ভিতর অবশ্য ফুলপুর সম্বন্ধে একটি যুক্তি খাড়া করা যায়। ফুলপুর কখনই সে অর্থে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি ছিল না। বরং, এটা দীর্ঘদিনের সমাজবাদীদের শক্ত ঘাঁটি। ২০১৪-র প্রবল মোদী হাওয়ায় এই কেন্দ্রটি বিজেপি দখল করেছিল। সেটি সমাজবাদী আবার ছিনিয়ে নিয়েছে। তবুও এই যুক্তিও যথেষ্ট নয় এই কারণেই যে, সমাজবাদীদের শক্ত ঘাঁটি দখল করলেও, তা রক্ষা করার জন্য বিজেপি কেন কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি?

তবে বিজেপিকে সব থেকে অবাক এবং একই সঙ্গে হতাশ নিশ্চয়ই করেছে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের গোরক্ষপুর কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রটির সঙ্গে যোগী আদিত্যনাথের নাম এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, এই কেন্দ্রে বিজেপি কখনও হারতে পারে, এই ভাবনাটিই ছিল অকল্পনীয়। ষাটের দশক থেকেই এই আসনটি কার্যত হিন্দুত্ববাদীদের দখলে। গোরক্ষনাথ মন্দিরের মঠাধ্যক্ষরাই এই আসনটিতে বারবার জয়ী হয়ে এসেছেন। হিন্দু মহাসভার নেতা এবং গোরক্ষনাথ মঠের প্রধান যোগী দিগ্বিজয়নাথ সেই ষাটের দশকেই এখানে জয়ী হন। তাঁর প্রয়াণের পর ১৯৭০-এ এই কেন্দ্র থেকে জেতেন যোগী আদিত্যনাথের গুরু এবং এই মঠের তৎকালীন প্রধান যোগী অবৈদ্যনাথ। যোগী অবৈদ্যনাথের পরে এখান থেকে পরপর ছ'বার লোকসভায় নির্বাচিত হন যোগী আদিত্যনাথ। হিন্দুত্ববাদীদের এমন একটি সুদৃঢ় ঘাঁটিতেই যে বিজেপিকে হেরে যেতে হবে কে ভেবেছিল।

এখন প্রশ্ন, উত্তরপ্রদেশে এই উপনির্বাচনের ফল বিজেপির পক্ষে আশানুরূপ হলো না কেন? এই উপনির্বাচনে

দেখা গিয়েছে, এই দুটি কেন্দ্রেই এবার ভোট পড়ার হার বেশ কম। গোরক্ষপুরে ভোট পড়েছে ৪৭.৫ শতাংশ আর ফুলপুরে ৩৭.৪ শতাংশ। সাধারণত উপনির্বাচনগুলিতে কম ভোট পড়ে। কিন্তু অন্যান্য উপনির্বাচনের থেকেও এই হার কম। অর্থাৎ অনেক ভোটারই ভোট দিতে আসার আগ্রহ দেখাননি। নির্বাচনী বিশ্লেষকরা মনে করেন, ভোটাররা যখন ধরেই নেয় স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে— তখনই তাদের একাংশ ভোট দেওয়ার আগ্রহ দেখায় না। অর্থাৎ একটা আত্মতুষ্টির মনোভাব তাদের ভিতর দেখা যায়। গোরক্ষপুর এবং ফুলপুরে নির্বাচকমণ্ডলীর ভিতর সেই আত্মতুষ্টি কাজ করেছে কিনা, তা বিচার করবেন ভোট বিশেষজ্ঞরা এবং বিজেপি। তবে, এটুকু বলা যায়, সাধারণ নির্বাচনে যদি ভোট পড়ার হার বাড়ে— তাহলে হয়তো বিজেপির হতাশ হওয়ার মতো কিছু নাও ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে, উত্তরপ্রদেশের এই দুটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল দেখে যারা উল্লসিত হয়ে উঠছেন— তাঁদের অবস্থা অনেকটা গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলের মতো বলা যায়।

তবু, উপনির্বাচনের এই ফল বিজেপির কাছে একটি সতর্কবার্তা তো বটেই। উপনির্বাচনে বিপর্যয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, অতিরিক্ত আত্মসন্তুষ্টিই হারের কারণ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন, তখন মানতেই হবে, এই বক্তব্যের পিছনে যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে। গোরক্ষপুর এবং ফুলপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট পড়ার শতাংশের দিকে নজর করলেই বুঝতে পারবেন, বিজেপি এই দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে এবার যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেনি। বরং অনেকটাই ঢিলেঢালা তারা ছিল। যে কারণেই উপনির্বাচনের দিন ভোটারদের সংগঠিত করতেও তারা ব্যর্থ হয়েছে। তার মাশুল তাদের দিতে হয়েছে। বিজেপি হয়তো এরকমই মনে করেছিল যোগী আদিত্যনাথের ব্যক্তিগত ক্যারিশমায় এই উপনির্বাচন তারা সহজেই জিতে আসতে পারবে। যদি এরকম তারা ভেবে থাকে, তাহলে তাদের মনে রাখা উচিত, এই ভাবনা নির্বাচনী যুদ্ধে ব্যুমেরাং হয়ে যেতে পারে। সংগঠনের উর্ধ্বে যে কোনও ব্যক্তিই নয়— এই ভাবনাই সংগঠনকে শক্তিশালী করে। কয়েক মাস আগেই গোরক্ষপুরের একটি হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির সতর্ক হওয়া উচিত ছিল--- জনগণের ভিতর এ সম্পর্কে এখনও কোনও ক্ষোভ আছে কিনা সে বিষয়ে। গোরক্ষপুর লোকসভা কেন্দ্রের একটি বড় অংশ গ্রামীণ। গ্রামীণ মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ সম্বন্ধেও সচেতন হওয়া উচিত ছিল বিজেপির। সমাজবাদী এবং বহুজন সমাজবাদী পার্টি জোট বাঁধলে শক্ত প্রতিরোধের মুখে যে পড়তে হতে পারে— এটা বুঝতেও বিজেপি নিশ্চয়ই ভুল করেছিল। আর একটি বিষয়ও বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিচারের ভিতর রাখা উচিত ছিল। গোরক্ষপুর লোকসভা আসনটিতে গত পাঁচ দশক ধরে গোরক্ষনাথ মন্দিরের সন্তদেরই প্রার্থী হিসেবে দেখতে পছন্দ করেছেন ওই কেন্দ্রের ভোটদাতারা। সেক্ষেত্রে অন্য কাউকে প্রার্থী করার আগে উচিত ছিল--- ভোটদাতাদের এই আবেগকে গুরুত্ব দেওয়া।

শুধু এই উপনির্বাচন নয়। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ঘটনায় দেখা গিয়েছে— তৃণমূল স্তরের মানুষের বার্তা বুঝতে বিজেপি নেতৃত্বের ভুল হয়ে যাচ্ছে। এটা হয় তখনই, যখন নেতৃত্ব আত্মশ্লাঘায় ভুগতে থাকে। গত বছর গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয় পেয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু সে জয় বেশ শক্ত লড়াইয়ের পরই এসেছে। গুজরাটে পরপর ছ'বার সরকার গঠন করা নিঃসন্দেহে বিজেপির পক্ষে কৃতিত্বের। সে কৃতিত্বকে এতটুকু খাটো না করেও মনে রাখতে হবে, গুজরাটে এক অংশের মানুষের ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে বিধানসভা নির্বাচনে। নির্বাচনের আগে ওই মানুষদের বার্তা বিজেপি নেতৃত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। পাশাপাশি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। একথাও অস্বীকার করা যায় না, কৃষকদের অনেক সমস্যাই দূর করা যায়নি। গ্রাম ভারতের দিকে যতটা দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল— ততটা দেওয়া হয়নি— একথাও ঠিক। গত বিজয়া দশমীর ভাষণে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতও গ্রাম ভারতের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেছেন। আশার কথা, এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক এবং কৃষিক্ষেত্রের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রে কৃষকরা পদযাত্রা করল। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই কৃষকদের সেই বিক্ষোভকে মোকাবিলা করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তবু বলব, এ ব্যাপারে সরকারের অনেক আগেই সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল। তাহলে খামোকা বামপন্থীরা কৃষককে খেপিয়ে তুলে প্রচারের আলোয় আসতে পারত না। বামপন্থী সংগঠনগুলি এবার কৃষকদের নিয়ে লখনউ অভিযানের ডাক দিয়েছে। তার আগেই গুরুত্ব দিয়ে কৃষকদের দাবি-দাওয়াগুলি নিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকার চিন্তাভাবনা করলেই ভালো।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের দামামা এখন থেকেই বেজে গেছে। তার আগে এবছর কর্ণাটক, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচন। এই তিনটি রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি যদি ভালো ফল করতে পারে, তাহলে ২০১৯-এ তারা অনেকটাই এগিয়ে থাকবে। এর মধ্যে আবার রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। এই অবস্থায় আত্মতুষ্টিতে ভোগার জায়গা বিজেপির নেই। আত্মতুষ্টিতে ভুগলে তার মাশুল কীভাবে দিতে হয় তা অতি সম্প্রতি গোরক্ষপুর আর ফুলপুরে দেখেছে বিজেপি। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিই আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে— এ নিয়েও কোনও সংশয় নেই। কিন্তু যদি একটি আসনও কমে যায়— তবে সেটিই হবে লজ্জার। বরং, সমস্ত আত্মসন্তুষ্টি ঝেড়ে ফেলে পূর্ণ উদ্যমে লড়াই করে বিজেপি যদি আরও আসন বাড়িয়ে নিতে পারে— সেটিই হবে বিরোধীদের প্রতি সমুচিত জবাব।

এই সময়

শীতল বিস্ফোরণ

মোবাইল ফোনে বিস্ফোরণের কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। কিন্তু ফ্রিজে বিস্ফোরণের কথা

বেশি শোনা যায় না। চীনে এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছে। চীনের একটি ইন্টারনেট কাফের ফ্রিজে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে। ভাগ্য ভালো কেউ হতাহত হয়নি।

প্রিয় সুধীজন

পরীক্ষার চাপ এবং বড় হয়ে কিছু হয়ে ওঠার চাপ কিশোর মনে কতটা কুপ্রভাব ফেলতে পারে তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে ফেসবুকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র লিখেছে, পরীক্ষা হলো শর্মাজীর আর একটি ছেলেকে খুঁজে বের করার পদ্ধতি। এই শর্মাজী বিখ্যাত ছবি 'থ্রি ইডিয়টসে'র একটি চরিত্র। যার ছেলে পরীক্ষার চাপে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।

কাবুলিওয়ালি

জাহান তাব আফগানিস্তানের নাগরিক। তালিবানি ফতোয়ায় সেদেশে মহিলাদের পর্দার

বাইরে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু জাহান অন্যায় জুলুম মানতে রাজি নন। তিনি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছেন। পাশ করলে চাকরি করতে চান জাহান।

সমাবেশ -সমাচার

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন

গত ১১ মার্চ বঙ্গীয় শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের ২১তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বালুরঘাট শহরের অভিযাত্রী বিদ্যানিকেতনে। সম্মেলনে ৮০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত এবং

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সত্যনারায়ণ মজুমদার। সম্মেলনে ২৮ জন শিক্ষক নিয়ে জেলা সমিতি তৈরি হয়েছে। পূর্বতন জেলা সম্পাদক সহদেব সাহাকে রাজ্য সহ-সম্পাদক করা হয়। জেলা সভাপতি হন বাসুদেব মণ্ডল।

ভারত-তিব্বত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা সভা

গত ১৫ মার্চ কলকাতায় আশুতোষ হলে ভারত-তিব্বত সহযোগ মঞ্চের (পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন হরিয়ানা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. কুলদীপ অগ্নিহোত্রী। প্রধান অতিথি ছিলেন লকেট চ্যাটার্জী। অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন মঞ্চের জাতীয় সম্পাদক শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী, মোহনলাল পারিখ, সি.এ এবং মঞ্চের সর্বভারতীয় কোষাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট রবীন্দ্র গুপ্ত। ভারত-তিব্বত সম্পর্কের বিষয়ে বক্তারা যা বলেন তার মূল কথা হলো— হিমালয়ের পাদদেশে 'তিব্বত' এক সুন্দর শান্তিপ্রিয় দেশ। আগ্রাসন-প্রিয় চীন ছলে-বলে- কৌশলে এই তিব্বতকে দখল করে নেয়। দুঃখের বিষয় হলো ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু চীনের সেই জবর দখলকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিব্বতবাসীদের কাছে ভারতের এহেন আচরণ ছিল একটা বড় আঘাত, বিশ্বাসঘাতকতার মতো। কারণ ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক আবহমানকাল থেকেই ছিল খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ। তিব্বতের সঙ্গে যাতায়াত, ব্যাবসা-বাণিজ্য, মানস সরোবরে যাওয়া ইত্যাদিতে কোনও পাসপোর্ট, ভিসা, অনুমতি, লাইসেন্সের প্রয়োজন হতো না। ভারতের জন্য তিব্বত ছিল আগ্রাসী চীনকে ঠেকানোর জন্য একটা Buffer wall দেয়ালের মতো। তিব্বত-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত ও সংস্কৃতির অনেক মিল আছে। তারা বন্ধুসুলভ ভারতকে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সমীহের চোখে দেখে ও ভারতের উপর আস্থা, বিশ্বাস, ভরসা করে।

চীনের আগ্রাসী নীতি ও ব্যবহারে এই সব ছোট ছোট দেশ সর্বদা ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে

এই সময়

ট্যাক্সি চড়ে ডাকাতি

আমেরিকার ডেরিক ফারিয়া বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। ব্যাঙ্ক ডাকাতি করার পরিকল্পনা করে সে ট্যাক্সি চড়ে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে পৌঁছয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী ডাকাতির পর সে ট্যাক্সি চড়েই ফিরে যায়। ভাড়াও মেটায় ডাকাতির টাকায়।

ট্যাক্সিতে উত্তর কোরিয়া

একে কী বলবেন, পাগলামি? বেঙ্গালুরু নিবাসী ছাত্র প্রশান্ত শাহী ওলার ট্যাক্সি বুক

করে। তার গন্তব্য উত্তর কোরিয়ার দক্ষিণ পিওঙ্গান। সব থেকে মজার ব্যাপার ওলা কর্তৃপক্ষ প্রশান্তর বুকিং মান্যতা দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেয়। পরে সব শুনে ড্রাইভারের মাথায় হাত!

স্টার্ট আপস

মোদী সরকারের স্টার্ট আপ প্রকল্প কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে জরুরি। তেলেঙ্গানার তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী কে টি রামা রাও

এই কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেন, স্টার্ট আপ প্রকল্পগুলিতে নবীন প্রজন্ম যাতে আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসে তার জন্য রাজ্য সরকার কাজ করতে চায়।

সমাবেশ -সমাচার

এই ভেবে যে কখন চীন আক্রমণ করবে, তাদের কোনও ভূমি খণ্ডকে কোনও অজুহাতে বা শক্তি প্রয়োগ করে দখল করে নেবে। তারা এব্যাপারে ভারতের উপর বিশ্বাস করে ভরসা রাখে এই ভেবে যে ভারত বিপদের দিনে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। তাই তারা ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলে। ভারত চীনকে বন্ধু ভেবে, তিব্বতের প্রতি তার পুরনো ভুল বুঝতে পেরেছে এবং তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে আগ্রহী এবং এনিয়ে এখন সচেষ্ট।

তিব্বতের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার রক্ষার্থে 'পঞ্চশীল' নীতির সম্মান দিয়ে তিব্বতকে সবরকম সহায়তা করতে ভারত বদ্ধপরিকর। সব বাধা দূর করে তিব্বতের এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভারতকে সাহায্য করতে হবে এবং নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে এই প্রচেষ্টা কৃতকার্য হয়।

বাঁ দিক থেকে তৃতীয় ড. অগ্নিহোত্রী, লকেট চ্যাটার্জী, ড. মোহন পারিখ।

মঞ্চের পক্ষ থেকে সবাইকে আহ্বান জানানো হয় যে ১০০-১৫০ জন মিলে গ্রুপ করে মাঝে মাঝে তাওয়াং (পঞ্চম দলাই লামার জন্মস্থান), বোমডিলা, অরুণাচল প্রদেশ, আন্দামান (যেখানে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস আইএনএ-র পতাকা উড়িয়ে ছিলেন) ইত্যাদি জায়গায় ভ্রমণে যেতে হবে— সেখানের লোকজনদের সঙ্গে মিলে মিশে একাত্ম হবার প্রচেষ্টা করতে হবে। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হয়।

বাগবাজার ভাগবত সভার উদ্যোগে গঙ্গাবক্ষে নামসংকীর্তন

বাগবাজার ভাগবত সভার উদ্যোগে গত ৪ মার্চ সারাদিন গঙ্গাবক্ষে লঞ্চ ভ্রমণটি সব অর্থেই এক ভাবগম্ভীর মাত্রা এবং আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ পূজা নামসংকীর্তন সহযোগে এই ভ্রমণে প্রায় তিনশো জন ভক্ত অংশ নিয়েছিলেন। এই ভক্তদের মধ্যে আয়োজক সংস্থার সদস্য-সদস্যা ছাড়াও ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিধাননগর শাখার বেশ কয়েকজন স্বয়ংসেবক এবং পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা ও হাওড়া মহানগর সমিতির বহু পুরুষ ও মহিলা কার্যকর্তা। কল্যাণ আশ্রমের মহিলা সমিতি গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন।

এছাড়া রানি রাসমণির বহুমুখী জীবন, কর্মকাণ্ড, ভারতবর্ষের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা নিয়ে মননশীল আলোচনা করেন ভাগবত সভার কার্যকর্তারা। বিখ্যাত কীর্তনিয়া শিবানী ঘোষ ও তাঁর সঙ্গীরা গৌরলীলা, বৃন্দাবনলীলা, অষ্টকালী লীলা পরিবেশন করে সমগ্র অনুষ্ঠানকে উপভোগ্য করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেন সংগঠক অর্জুন চন্দ।

এই সময়

ঝাড়খণ্ডে আমেরিকা

ঝাড়খণ্ড সরকার আমেরিকার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে উন্নয়নের কাজ করার কথা ভাবছে। সম্প্রতি ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত

কেনেথ জুস্টার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস এবং রাজ্যপাল দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে এই বিষয়ে প্রাথমিক পর্বের কথাবার্তা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিশ্ব জল দিবস

গত ২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। সারা বিশ্বের মানুষ এদিন জল বাঁচানোর সংকল্প গ্রহণ করেন। পরিবেশবিদেরা

জানিয়েছেন, ২০১০-এর মধ্যে ভারতের ২১টি শহরের ভূগর্ভস্থ জলস্তর নীচে নেমে যাবে। সুতরাং শুধু জল নয়, গাছও বাঁচান।

পাশে ভারত

মালদ্বীপে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হলো। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ভারত। মালদ্বীপ একটি স্থিতিশীল সরকার গঠিত হোক— এমনই

আশা প্রকাশ করেছে ভারত। ভারত যে মালদ্বীপের পাশে আছে এবং থাকবে, সরকারি বিবৃতিতে তাও জানানো হয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

ব্যাঙ্গালুরুতে সাড়ম্বরে হিন্দু বর্ষবরণ

গত ১৯ মার্চ স্বদেশী সঙ্ঘের উদ্যোগে সম্প্রতি ব্যাঙ্গালুরু শহরে সাড়ম্বরে হিন্দু নববর্ষ উগাদি উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গুরুমূর্তি রেড্ডি। প্রধান বক্তা বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ বি ভি শ্রীধরস্বামী। উগাদি পুজোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বদেশী সঙ্ঘের সহ-সভাপতি এন. শেষাদ্রী। মঙ্গলারতি করেন শ্রীমতী অরুণা জয়পাল। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বি ভি সুহাসিনী। উদ্বোধনের পর ছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভরতনাট্যম্ পরিবেশন করেন সুভাষিনী, মৃদঙ্গম বি ভি শ্রীনিধি। উগাদি মায়ের

গান গেয়ে শোনান এস ঐশ্বর্য এবং রাজেশ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা। পরিচালনা করেন আর শ্রীনিবাসন। এদিন স্বদেশী সঙ্ঘের একটি ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন সংস্থার সাংস্কৃতিক সচিব ইন্দ্রনীল বসু। এদিন থেকেই স্বদেশী সঙ্ঘের অফিসে সংস্কৃত শিক্ষার ক্লাস নেওয়া শুরু হয়েছে। বক্তাদের মধ্যে স্বদেশী সঙ্ঘের সভাপতি ড. এইচ নাগারত্না সংস্থার ইতিহাস, দর্শন এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে শ্রোতাদের অবহিত করেন। প্রধান অতিথি গুরুমূর্তি রেড্ডি পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বচ্ছতার ওপর জোর দেন। স্বদেশী সঙ্ঘ এই দুটি ক্ষেত্রে কী কাজ করছে তিনি তা তুলে ধরেন এবং উপস্থিত সকলকে স্বদেশী সঙ্ঘের লক্ষ্যপূরণে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। প্রধান বক্তা বি. ভি. শ্রীধরস্বামী স্বদেশী সঙ্ঘের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের বিকাশে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। অনুষ্ঠানের শেষে আন্তঃস্কুল অঙ্কন প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার এবং শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

বর্ধমানে রক্তদান শিবির

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বর্ধমান জেলা সেবা বিভাগের উদ্যোগে গত ১১ মার্চ রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও স্বয়ংসেবক প্রবীর লাহিড়ী। ৩০ জন রক্তদান করেন। শিবিরে উপস্থিত থেকে সবাইকে উৎসাহিত করেন বর্ধমান বিভাগ কার্যবাহ, বিভাগ সেবাপ্রমুখ এবং জেলা সঙ্ঘচালক।

কিষান সভার মুম্বাই অভিযান সফল হলেও

২০১৯-এ অ্যাডভানটেজ বিজেপি

অতিথি কলম

শৌভিক চক্রবর্তী

একটি অভিযান ও ২০১৮-র একটি উপনির্বাচন বিজেপির কাছে ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের নিরিখে একটি বার্তা পাঠাল। তবে, অবশ্যই আমাদের এই বার্তাটিকে সঠিকভাবে পড়তে বা বুঝতে হবে। ২৪ ঘণ্টাই যাঁরা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের পণ্ডিতসভা আলো করে থাকেন তাদের কাছে কৃষকদের এই দাবি আদায়ের অভিযান ও উত্তরপ্রদেশে সপা-বসপার ভোট একত্রিত হওয়াই বিজেপি যে জাতীয় রাজনীতিতে জমি হারাচ্ছে তারই প্রাথমিক ইঙ্গিত। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করা সমুচিত হবে না।

নিশ্চিতভাবেই গোরক্ষপুর যা কয়েক যুগ ধরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের গড় হিসেবেই চিহ্নিত, সেখানে শক্তি খোয়ানো যেমন যোগী সরকারের কাছে তেমন বৃহত্তর পরিসরে মোদী সরকারের কাছেও একটি হতচকিত হয়ে পড়ার মতো সিগনাল পাঠিয়েছে। বিজেপি দলও নড়েচড়ে বসছে, তবুও তাদের হাতে এখনও অনেক তাসই খেলা বাকি আছে।

এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে বসপা থেকে ভোট অত্যন্ত মসৃণভাবে অখিলেশের কাছে হাত বদল হয়েছে আর যে বিষয়টা গোরক্ষপুরের ক্ষেত্রে দল বুঝতে নিতান্তই ভুল করেছিল। তবে এটাই কি আগামী দিনে বিজেপি বিরোধী মডেল হিসেবে সমগ্র উত্তর প্রদেশে কাজ করবে? অর্থাৎ সপা-বসপা একসঙ্গে লড়বে আর যেখানে যার শক্তি বেশি সেখানে নিজেদের মতো করে আসন ভাগাভাগি করে নেবে। নিশ্চয় মনে আছে আর জে ডি-জে ডি ইউ-এর মহাগটবন্ধনের কাছে বিজেপি বিহার বিধানসভা নির্বাচন হেরেছিল। তবুও এত ধড়ফড় নয়। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, নিজেদের বাঁধা ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে চিরকাল যে কোনো কীর্তি করতে মরিয়া এই দুই দল উত্তরপ্রদেশ জুড়ে একজন করে প্রার্থীই খাড়া করতে সক্ষম হলো। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে থাকবে একটা নতুন সম্পূর্ণ নতুন, বিজেপি যাদের হাতে রয়েছে ভারতের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ একটি ভোট মোকাবিলায় সদা-প্রস্তুত বাহিনী। বস্তুত অনেকেই এটিকে আজকাল মেশিনের সঙ্গে তুলনা করছেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই ফলের পর বিজেপি নেতৃত্ব কৃৎকৌশল নির্মাণের ড্রয়িং বোর্ডের ঘরে নিশ্চিতভাবে ফের ঢুকে যাবেন। সম্পূর্ণ নতুন করে সব কিছুর মূল্যায়ন করবেন। মোদী-শাহ যুগলবন্দির বিজেপির কাছে উত্তরপ্রদেশ এখন একটা নির্বাচনী আপতকাল। আর হ্যাঁ, সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিজেপি নির্বাচনী ময়দানে উত্তর দিতে নামলে সেটিই এক চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখবে।

তাছাড়া লোকসভার উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে নাগরিকদের যে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় তার থেকে সর্বভারতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময় নির্বাচকমণ্ডলীর আচরণ সাধারণত আরও অনেক উজ্জীবিত হয়। ২০১৪ সালে মোদীর বিজেপি সর্বাংশেই কংগ্রেসের একমাত্র বিকল্প হয়ে উঠেছিল। সেই হিসেবে ২০১৯ সালের মোদীর বিজেপির বিকল্প কে? আলোচ্য উপনির্বাচনের পটভূমিতে একটা বিষয় কিন্তু তর্কাতীতভাবে উঠে এসেছে যে, ভারতের অন্যতম দুটি বৃহৎ রাজ্যে অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে কংগ্রেস ক্রমশই একটি রহস্যে পরিণত হতে হতে নিজের অজান্তেই নিজেকে অতীতে জীবিত থাকা কোনও দলে পরিণত করে ফেলেছে। মনে রাখতে হবে, ২০১৯-এর কংগ্রেস কিন্তু কখনই ২০০৮-২০০৯-এর কংগ্রেসের শক্তি বা চেহারায় ফিরে যেতে পারবে না।

“উপনির্বাচনের পটভূমিতে একটা বিষয় কিন্তু তর্কাতীতভাবে উঠে এসেছে যে, ভারতের অন্যতম দুটি বৃহৎ রাজ্যে অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে কংগ্রেস ক্রমশই একটি রহস্যে পরিণত হতে হতে নিজের অজান্তেই নিজেকে অতীতে জীবিত থাকা কোনও দলে পরিণত করে ফেলেছে। মনে রাখতে হবে, ২০১৯-এর কংগ্রেস কিন্তু কখনই ২০০৮-২০০৯-এর কংগ্রেসের শক্তি বা চেহারায় ফিরে যেতে পারবে না।”

এই অবস্থায় কংগ্রেস যদি লোকসভার ভোট নড়বড়ে ভাবে লড়ে যার পেছনে রয়েছে সাম্প্রতিক নির্বাচনী হারে করুণ সংখ্যাতত্ত্ব, সেক্ষেত্রে সর্বক্ষণই তাদের ডজন খানেক প্রাদেশিক রাজা-রানির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। ভোটারদের কাছে এই ‘সর্বভারতীয় বিরোধীদল’ আসলে একটি সর্বদলীয় সরকারের সম্ভাব্য সদস্য হিসেবে নির্বাচনে লড়বে। একথা অবশ্যই ভোটাররা ভাববে। এর ফলে মোদীর বিজেপির বিরুদ্ধে যদি সে ধরনের অসন্তোষ ধূমায়িত হয় তাহলেও কিন্তু ভোটাররা কেন্দ্রীভূত কোনও বিরোধীকে হাতের কাছে পাবে না আর তার

ফলে অবশ্যই অ্যাডভানটেজ বিজেপি আজকের তারিখে। কিন্তু দেশব্যাপী কিষান ভোটকে সংহত করার ক্ষেত্রে এই বহু দলে বিভক্ত, ভঙ্গুর বিরোধী দলের মধ্যে আটকে থাকা কৃষক সমর্থন একটা বড় বিষয় হয়ে দেখা দেবে। কৃষক ভোট নিশ্চিতভাবে বিজেপির কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে নিবিড় গবেষণারত বিশ্লেষকরা বলছেন, ২০১৪ থেকে আজ পর্যন্ত বিজেপির কিষান ভোট কিন্তু পড়তির দিকে। কিন্তু হায়! এই কিষান জাঠা কিন্তু সিপিএমের কিষান সভার নেতৃত্বে হয়েছিল কংগ্রেস সেখানে ছিল নীরব দর্শক। অন্যদিকে গুজরাট বিধানসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনের সময় সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের বিজেপি যখন কিষানদের কাছ থেকে ব্যাপক ঝড় ঝাপটার ধাক্কা খাচ্ছে সেখানেও কংগ্রেসের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। গুজরাট অনেকটাই ছিল কৃষকদের দীর্ঘদিনের ফসলের কম দাম সংক্রান্ত অভিযোগের অবহেলা করে শাসনক্ষমতায় থাকা বিজেপির নিশ্চিত আত্মঘাতী গোল। হয়তো দেরিতে হলেও কংগ্রেসের তাত্ত্বিক নেতা অভিষেক মনু সিংভি ঠিকই বলে ফেলেছেন যে তৃণমূল স্তর থেকে কোনও আন্দোলন সংঘটিত করতে হলে কংগ্রেসকে এখনও বহু পথ হাঁটতে হবে। তাই যদিও দেশ জুড়ে কোনও শাসক বিরোধী বিক্ষুব্ধ কিষান ভোট তৈরিও হয় তাকে সংঘটিত করার মতো জাতীয় স্তরে আন্দোলন থেকে উঠে আসা কোনও কেন্দ্রীয় দল ও নেতা নেই।

লোকসভা নির্বাচনের আর মাত্র তেরো মাস আগে কিছু কিছু কাঠামোগত বাস্তবতার ওপর নির্ভর করে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন মোটেই সম্ভব নয়। কিন্তু নির্বাচন হচ্ছে চারটি বস্তুর সমাহার— যথাযথ সংযোগ করা ও চলতি পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে নিজের অনুকুলে নিয়ে আসা। এর সঙ্গে যোগ হয় ভাগ্য আর অবশ্যই অর্থানুকুল্য। এই চার মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিচার করলে উত্তপ্ত কৃষকদের ঠাণ্ডা করে নিজের দিকে নিয়ে আসবার আয়ুধ বিজেপি'র আয়ত্তেই রয়েছে।

হ্যাঁ, জনসংযোগ বা সঠিক বার্তাটি পাঠানো। গ্রামীণ ভোট বললে কিন্তু কেবলই কৃষক ভোট বোঝায় না। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ ভোটার কিন্তু জমিহীন, নিজস্ব ফসলের মালিকানাহীন শ্রমিক। এদের জন্য দল রান্নার গ্যাস দেওয়ায়, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণে ইতিমধ্যেই ব্যাপক জোর দিয়েছে ও সফলও হয়েছে। অন্যদিকে এখনও পুরোদস্তুর চালু না হলেও জাতীয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প কিন্তু আলোচ্য গরিব নির্বাচকমণ্ডলীর জীবনে বড় সড় পরিবর্তন আনার সম্ভাবনাধারী। নির্বাচনী আয়ুধ হিসেবে তা মোটেই হেলাফেলার নয়।

এছাড়া কৃষকদের জন্য মোদী সরকার শস্যবিমা প্রকল্প ও সর্বভারতীয় বাজার তৈরির প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়িত না হওয়ায় কৃষকরা এর সুফল পাচ্ছেন না। কিন্তু এমন কোনও বিজেপি বিরোধী দল কি আছে যারা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে তারা কৃষকদের জন্য পরিকল্পিত যে কোনও প্রকল্পকে অতি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করে দিতে পারবে। দেশব্যাপী ব্যাপক বিজেপি বিরোধী কিষান বিক্ষোভ একটি নির্বাচনী পরিবর্তন আনার সম্ভাবনাময় তখনই হয়ে উঠতে পারে যদি কৃষকদের মন পরিবর্তনের জন্য বিজেপির কিছুই না বলার থাকে। অন্যদিকে আর একটি দল অতি বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প ও আকর্ষণীয় কোনও সমাধান নিয়ে জনতার কাছে পৌঁছতে উন্মুখ থাকে। দু'টোর কোনওটাই আলোচনার যোগ্য নয়, কেননা তা অলীক। ব্যবস্থাপনা বা ম্যাজেমেন্ট : ডাল নিয়ে হাঙ্গামার প্রেক্ষিতে গুজরাট ভোটের পর সরকার ডাল আমদানি করা অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে যাতে কৃষকদের দাম পেতে সুবিধে হয়। উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের আগে বিজেপি রাজ্যব্যাপী কৃষি ঋণ মকুবের ঘোষণা করে। একইভাবে কৃষকদের মুম্বই অভিযানের পর তাদের বড় আকারে ঋণ মকুবের নতুন প্রস্তাব মহারাষ্ট্র সরকার মেনে নিয়েছে। মধ্যপ্রদেশে কৃষিপণ্যের দাম বাজারে অত্যধিক নেমে গেলে তাকে ভরপাই করতে রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই একটি প্রকল্প চালাচ্ছে পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এটির ক্রমোন্নতি হচ্ছে। বাস্তবে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রধান বড় রাজ্যগুলির অনেকগুলিতেই ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বিজেপির হাতে কৃষকদের সমস্যার অনেকেই চটজলদি সমাধান আছে। প্রয়োজন হলেই তারা অপ্রসন্ন কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাবার টোটকা বার করতে পারে যাতে তাদের সমর্থন অটুট থাকে। তাই কে বলতে পারে যদি দেখা যায় যে দেশব্যাপী কৃষি ঋণ মকুবের দাবি সেইভাবে জোরদার হয়ে দানা পাকাচ্ছে সেক্ষেত্রে জাতীয় ঋণ মকুব প্রকল্প ঘোষিত হয়ে নির্বাচনের অভিমুখটিই ঘুরিয়ে দিতে পাবে।

ভাগ্য : বর্ষার পূর্বাভাষ স্বাভাবিক। মানতেই হবে ভালো বর্ষা হলেই যে কৃষক ফসল বেচে লাভ করবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কেননা ফসলের অতিরিক্ত উৎপাদন অর্থাৎ বাম্পার উৎপাদনে দাম পড়ে যাবে। অন্যদিকে খারাপ বর্ষা কিন্তু যে কোনও দলের পক্ষেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা বড় অসুবিধে সৃষ্টি করতে পারে। বিজেপির ক্ষেত্রেও সেক্ষেত্রে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার কথা কিন্তু ওই লাখ প্রশ্নে যেহেতু পূর্বাভাষ ভালো তাই বিজেপি এগিয়ে।

পূর্বের সুকর্ম থাকলে ভাগ্যের সহায়তা যে অনেক সময়ই পাওয়া যায় তার প্রমাণ জিডিপি-র বৃদ্ধিতে ইতিবাচক পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ভোট যত এগিয়ে আসবে অর্থাৎ আগামী দিনে কৃষি, নির্মাণ ও সর্বোপরি উৎপাদন শিল্পে যে দ্রুত বৃদ্ধি সূচিত হয়েছে তা আরও বেগবান হবে। ক্ষমতাসীন কোনও দল যদি ক্রমবর্ধমান জিডিপির হার নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর মুখোমুখি হয় যেখানে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিই ঊর্ধ্বমুখী ও যার পরিণতিতে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভব সেক্ষেত্রে সেই দল নিশ্চিতভাবেই বাড়তি সুবিধের জায়গায় থাকবে। আর টাকার ব্যাপারটা তো চিরকালই ছিল। ২০১৯-এর নির্বাচন বিজেপি তীব্র প্রতিজ্ঞা ও বিজয়াকাঙ্ক্ষা নিয়েই শুধু লড়বে না সঙ্গে থাকবে তাকে যুদ্ধ উপযুক্ত করার মতো এযাবৎ ভারতীয় নির্বাচনী ইতিহাসের সর্বাধিক অর্থবল। বুথস্তরের সৈনিকদের প্রচারের উৎসাহ হিসেবে যদি সন্তোষজনক অর্থনৈতিক সহায়তাটাও দেওয়া যায় তৃণমূল স্তরে পরিস্থিতি অনুকূল করতে তা বাড়তি সাহায্য করে। কাজে আসে বাড়তি উদ্দীপনা। তাই মুম্বই মার্চ আর গোরক্ষপুর ২০১৮-র মার্চে বিজেপিকে নির্দিষ্ট বার্তা দিলেও ২০১৯-এ কিন্তু অ্যাভেন্টেজ বিজেপিই। ■

চিঠিপত্র

ত্রিপুরায় পদ্ম

'স্বস্তিকা'র ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সংখ্যার প্রচ্ছদপটে লেখা ''ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্তন নয়, পরিবর্তনের হাওয়া বিজেপির পক্ষে''— সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। এ যেন 'জিরো' থেকে 'হিরো'। মজার ব্যাপার হলো— ত্রিপুরা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোটের গড় ২.৮৪। জামানত জব্দ সব প্রার্থীর। সত্যি বলতে কী, গেরুয়া ঝড়ে ত্রিপুরার লালদুর্গ লণ্ডভণ্ড। নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব ঘটনা। ঐতিহাসিকও বটে। আর বাকি রইল কেরল। তবে কেরলে প্রতি ৫ বছর অন্তর ক্ষমতার হাত বদল ঘটে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মধ্যে। সেই বিচারে ভারতবর্ষে বামপন্থা বা কমিউনিজমের সূর্য অস্তাচলে। আর এটাই স্বাভাবিক এবং সত্য। কারণ ভুল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনও আদর্শ বা তত্ত্ব এই পরিবর্তনশীল আধুনিক যুগে বেশিদিন স্থায়ী হয় না।

মার্কসবাদ, মাওবাদ, লেনিনবাদ বা স্ট্যালিনবাদ, যে 'বাদ'ই হোক না কেন তা এককালে বিশেষত মধ্যযুগে প্রযোজ্য ছিল। কেননা তখন সমাজে ছিল সামন্তপ্রথা, দাসপ্রথা, বেগারখাটানো, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদির ন্যায় বৈষম্যমূলক, অমানবিক তথা অসামাজিক রীতিনীতি, যার বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম সংঘটিত করতে মেহনতি মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আধুনিক যুগে কোনও কমিউনিস্ট মতবাদের আর প্রাসঙ্গিকতা নেই। কারণ বিশ্বের কয়েকটি কমিউনিস্ট, রাজতান্ত্রিক বা একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাদ দিলে সব রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সমাজেও ফিরে এসেছে বহুলাংশে সাম্য, স্বনির্ভরশীলতা ও আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার প্রতিযোগিতা। স্বভাবতই মার্কসবাদী বা মাওবাদের শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রেণী শত্রু (বুর্জোয়া) খতম, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, সর্বহারার একনায়কবাদ ইত্যাদিও তাদের প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে। আটের দশকের শেষে কমিউনিস্ট বিশ্বের মানুষ সমাজতন্ত্রের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে হয়েছিল উদ্‌গ্রীব। প্রাক্তন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভ করেন সোভিয়েত 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রৈকা' তত্ত্ব চালু, যার অভিঘাতে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙেই চূর্ণ হয়নি, প্রায় এক ডজন রাষ্ট্র থেকে অপসৃত হয়েছে সমাজতন্ত্র। অর্থাৎ, কমিউনিস্টদের সাজানো বাগান আজ মরুভূমি।

তাই কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সাইনবোর্ড সর্বস্ব পার্টিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে, বিদেশি-বিধর্মী আক্রমণকারীদের এদেশে সহস্রাধিক বছরের শাসন, শোষণ ও নির্যাতন হিন্দুত্বের প্রাণভ্রমরার মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। আজ অনুকূল পরিবেশে হিন্দুমনে হিন্দুত্বের অনুভূতি আবার চাগাড় দিয়ে উঠেছে। তাই ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে বিজেপির জয় মানে হিন্দুত্বের জয়। আর কমিউনিস্ট- সেকুলারিস্টদের পরাজয়। তাঁদের অন্তর্জলি যাত্রা' এখন সময়ের অপেক্ষা।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট সরকারের পতন ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

অতি সম্প্রতি ত্রিপুরার কমিউনিস্ট দুর্গের পতনে পশ্চিমবঙ্গের কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী জননেত্রীর ব্যথিত হওয়ার কারণ খুঁজতে আমার এই লেখা। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ একসময় তাঁর প্রিয় ছাত্র সমীপে রহস্য করে বলেছিলেন— 'Cut out the 'Class war' stuff from communism and I am a communist.' 'কমিউনিজম থেকে 'শ্রেণী সংগ্রাম' কাণ্ডটি কেটে দিলে আমি নিজেকে কমিউনিস্ট বলতে রাজি।' এই মহামূল্যবান উক্তিটি যেসব ছাত্রের সমীপে তিনি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন কমিউনিস্ট নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের প্রথম ভাগে তখন সবেমাত্র কমিউনিস্টরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি একটা ছদ্ম-বিপ্লবীয়ানার মহড়া নিয়ে ব্যস্ত। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ প্যারিস শহর থেকে শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া শাসকদের হটিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়েছিল। ২৮ মার্চ দশদিন পর তারা গঠন করেছিল পৃথিবীর প্রথম প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্র—'প্যারিস কমিউন'। একেবারে নতুন ধরনের রাষ্ট্র। জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনগণের জন্য সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে। এই প্যারিস কমিউন প্রসঙ্গে লেনিন কী বলেছিলেন একবার স্মরণ করা যাক— 'প্যারিস কমিউন ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতকে শিক্ষা দিয়ে গেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যকর্মগুলি সঠিকভাবে উপস্থিত করতে।' যে কমিউন নিয়ে বিশ্বের কমিউনিস্টরা গর্ব করে সেই প্যারি কমিউন মাত্র ৭০ দিন জীবিত ছিল। ১৮৭০-র প্যারি কমিউনের 'শ্রেণী সংগ্রাম'-এর পর রাশিয়া বিশ্বের মধ্যে প্রথম রাষ্ট্র যেখানে কমিউনিজমের সফল প্রয়োগ হয়েছিল বলে আমাদের দেশের সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দাবি করেন। ১৯৩৩-এর ১৬ মার্চ পণ্ডিত নেহরু 'বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ' গ্রন্থের 'জারের রাজ্য রাশিয়া' নিবন্ধে গালভরা আলোচনা করেছিলেন সেখান থেকে কিছু উদ্ধৃতি : 'রাশিয়া এখন সোভিয়েত দেশ, তার শাসনকার্য চলছে শ্রমিক আর কৃষকদের প্রতিনিধিদের দিয়ে। কোনও কোনও দিক দিয়ে রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী দেশ।'

ত্রিশের দশকে একদিকে যখন জাতীয়

কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজ না স্বায়ত্তশাসন এবং অপরদিকে মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবি নিয়ে ত্রিশঙ্কু অবস্থা তখন পণ্ডিত নেহরু জেলে বসে রাশিয়ার লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৫-র নভেম্বর বিপ্লবের সার্থকনামা প্রচারে ব্যস্ত।

জাতীয় নেতাদের এইরূপ অবিমৃশ্যকারিতার জন্য সুযোগ বুঝে মুসলিম লিগ হাসতে হাসতে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান ছিনিয়ে নিল। আর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভারতীয় 'জাতীয়তা' শব্দটি এক লহমার মিলিয়ে গিয়ে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি জাতীয় নেতাদের মূলমন্ত্র হয়ে গেল। ১৮৭০-এর ঐতিহাসিক প্যারি কমিউনের একশো বছর পর ১৯৭০-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদরদি অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেন শ্রেণীশত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ছাত্রদের হাতে খুন হলেন। তাঁর খুনিরা তৎকালীন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীর বদান্যতায় পার পেয়ে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হলো।

আমি লেখার প্রথমে ড. রাধাকৃষ্ণানের উদ্ধৃতি দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, শেষে ড. রাধাকৃষ্ণানের একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট ছাত্র হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জির নিজের লেখা--- 'আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে' থেকে তাঁর জবানবন্দি দিয়ে লেখা শেষ করবো— 'কার সাধ্য আছে তথ্যের ভিত্তিতে কমিউনিস্টদের দেশপ্রেম নিয়ে বিদ্রূপ করার, তার গরিমাকে ম্লান করার?' এই বিশ্বাস কতটা অটুট তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'এখন কমিউনিস্টদের এই দেশপ্রেমে ভাগ বসিয়েছে আরও একটি প্রেম।' এই প্রেম কি? এই বিষয়ে হীরেনবাবু নীরব ছিলেন। সোভিয়েত দেশ পতনের পর হীরেনবাবু এই পুস্তকে লিখেছিলেন--- 'সোভিয়েত আমারও দেশ। ---আমি ভারতীয়। ভারতবর্ষকে আমি ভালবাসি তবু বলি যে সোভিয়েতও আমার দেশ।'

পরবর্তী প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পর অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যদি আজ থাকতেন তাঁর সিদ্ধান্তের কোনও পরিবর্তন করতেন বলে মনে হয় না। কিন্তু ত্রিপুরার কমিউনিস্ট সরকারের পতনে আমাদের জননেত্রীর ব্যথিত হওয়ার সুলুক সন্ধান কে দেবে?

—**বিরূপেশ দাস,**
বর্ধমান।

কলকাতাকে আপন করতে চান 'নতুন হিন্দু'

সম্প্রতি কলকাতার কোনও এক দৈনিকে উক্ত শিরোনামের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে, যাতে দেখা যাচ্ছে শিলচরের হুসেন আলি নামে এক মুসলমান ভদ্রলোক সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় স-পরিবারে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এর পৃষ্ঠপোষক নাকি 'হিন্দু সংহতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এতে চারিদিকে গেল গেল রব উঠে হৈচৈ শুরু হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমি দুচার কথা বলতে চাই। প্রথমত, ভারতে ধর্মান্তরকরণ নতুন কিছু নয়। কিন্তু এতকাল তা ছিল এক তরফা অর্থাৎ শুধু হিন্দু থেকে মুসলমান বা খ্রিস্টান হওয়া। ফলে জনসাধারণের একরকম ধারণা হয়েছিল যে সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু মুসলমান থেকে হিন্দু হওয়া নৈব নৈব চ। তাহলে তা হবে অস্বাভাবিক। ফলে ভারতবর্ষে এতকাল এই একতরফা ধর্মান্তরকরণ চলছিল। কোটি কোটি হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। তাতে যা হবার তাই হয়েছে। ভারতের একটা বড় অংশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর ভারতে যেসব মুসলমান রয়ে গিয়েছেন তাঁরা সব উসখুস করছেন।

এখন দেখা যাক কেন এই একতরফা ধর্মান্তরকরণ। কারণ হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া এক প্রকার স্বাভাবিক বলে সবাই ধরে নিয়েছেন। তা নিয়ে কোনও হৈচৈ হয় না, কিন্তু মুসলমান থেকে হিন্দু হওয়া কোনওমতেই মেনে নেওয়া হয় না। তাই দেখা যায় মুসলমানরা বহু হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে নিয়েছেন। হাতের কাছে এই পশ্চিমবাংলায় তার বহু উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু কোনও মুসলমান মেয়ে হিন্দুকে বিয়ে করলেই সর্বনাশ। তৎক্ষণাৎ সেই হিন্দু যুবকের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়। এভাবে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪ পরগনায় বেশ কিছু হিন্দু যুবককে মুসলমান মেয়ে বিয়ে করার 'অপরাধে' নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারীদের কোনও শাস্তি হয়েছে বলে শোনা যায় না। সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায় তাঁদের গল্পের নায়ক মুসলমান আর নায়িকা হিন্দু। এর বিপরীত অর্থাৎ নায়ক হিন্দু আর নায়িকা মুসলমান লেখার সাহস তাঁদের কারও নেই। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে--- হিন্দু মেয়ে ঘরে তুলতে মুসলমানদের কোনও আপত্তি নেই— বরং তাতে তাঁদের প্রচণ্ড আগ্রহ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হিন্দুদের ঘরে মেয়ে দিতে তাঁদের প্রচণ্ড অনীহা যা শেষ পর্যন্ত অনেক সময় খুনোখুনিতে পরিণত হয়।

এখন দেখা যাক ভারতের এই মুসলমান কারা? এরা সব আরব দেশ থেকে আসেনি, এদের পূর্বপুরুষরা সব হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন অর্থাৎ এদের পূর্বপুরুষ সবাই হিন্দু ছিলেন। তাই এদের কেউ হিন্দু হলে তাকে ধর্মান্তর না বলে স্বধর্মে ফিরে আসা বলাই সঠিক। হিন্দীতে যাকে বলে ঘর ওয়াপসি। তাই শিলচরের হুসেন আলি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলা ঠিক নয়। বলা উচিৎ ছিল স্বধর্মে ফিরে এসেছেন। ভারতের অন্যান্যরা যদি হুসেন আলির মতো সৎ সাহস দেখাতে পারেন তবে দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলে কিছুই থাকবে না— কাশ্মীর সমস্যা দূর হবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, গত চতুর্দশ শতাব্দীতে এক মুসলমান বিজেতা কাশ্মীরের সব হিন্দু পণ্ডিতকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন যার ফলে আজ এই কাশ্মীর সমস্যা।

—**শশাঙ্ক,** কলকাতা-৬।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

উত্তর দিনাজপুরের প্রাণগঙ্গা কুলিক নদী

ড. বৃন্দাবন ঘোষ

ভারতবর্ষে নদী শুধু বহমান জলধারা নয়। মানবজীবনের প্রতিটি বাঁক এবং বাঁকবদলের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। নদীর আবেষ্টনীর মধ্যে জন্ম হয় সভ্যতার। আর নদীখাত বদলে গেলে পতন হয় তার। ভারতের ইতিহাসে সেই উত্থান-পতনের উদাহরণ অজস্র। উত্তর দিনাজপুরের প্রধান নদী কুলিকের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। এই জেলা যেন কুলিকেরই দান।

বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার রায়পুরের মরার বিল থেকে কুলিক নদীর উৎপত্তি। কেউ কেউ এই বিলকে ঝুমঝুম বিল বলে অভিহিত করেন। উৎপত্তি স্থল থেকে আসার পথে আরও কয়েকটি বিলের জল নালার মাধ্যমে তার সঙ্গে মিলিত হয়।

বাংলাদেশের গোবিন্দপুর থেকে কুলিক প্রথমে ভারতের মহিষাগাঁওয়ে প্রবেশ করে। তারপর সেখান থেকে এই নদী আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করে কিছু পথ বেয়ে পুনরায় ভারতের কেশবপুরে এসে পড়ে। সেখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমমুখী হয়ে দুই তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পাহাড়পুরের শিমুলডাঙ্গীর কাছে এসে দিক পরিবর্তন করে। কথিত আছে, শিয়ালডাঙ্গীতে তার গর্ভদেশে বিরাট মনির (গর্ত) সৃষ্টি হয়। সেই মনিতে নাকি এক সময় কুমির দেখা যেত। সেখানে তার পাড়ে প্রচুর শেয়ালও থাকতো। তাই ওই স্থান আজও শিয়ালডাঙ্গী নামে পরিচিত।

গাইডুবি এলাকায় কুলিক নদী উত্তর দিকে প্রবাহিত। সেখানেও একটি বড়ো মনি ছিল। তাই আজও ওই স্থান ঝাড়মনি নামে অভিহিত হয়। ওই মনির জলে একদা একটি গাই ডুবে মারা যায় বলে ওই জায়গা গাইডুবি নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রতি বছর সেখানে ফাল্গুন মাসে কালী পুজো হয়।

একদা চণ্ডিয়াঘাটে বিশাল একটি মনি ছিল এবং ওই মনি থেকে প্রচুর বোয়াল মাছ উঠতো। সেখানেও তার বাঁক দেখা দেয়। কুলিকের চাঁদিয়াডাঙ্গী ও ধরুইল ঘাটের মধ্যবর্তী স্থানের মরামনি খুব গভীর ছিল। ওই মনিতে প্রচুর মাছ জন্মাতো। একদিন স্থানীয় দুজন মানুষ সেখানে মাছ ধরার জন্য জাল ফেলেন। কিন্তু তাঁদের সেই জাল ওই গর্তে আটকে যায়। তখন তাঁদের মধ্যে একজন জাল তোলার জন্য মনির জলে ডুব দেন। উঠতে না পেরে সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তখন থেকে ওই মনি মরামনি নামে অভিহিত হয়। তারপর একশো কিলোমিটার পথে প্রায় ৫০টি জায়গায় এঁকে বেঁকে সাপের মতো তাকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। তাই কেউ কেউ বলে, অষ্টনাগের এক নাগ কুলিকের মতোই তার গতিপথ। তাই এই নদী কুলিক নামে অভিহিত হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এক সময় এই নদীর দুই তীরে প্রচুর কুলেখাড়া বা কুলিকা নামক শাক জন্মাতো বলে তার কুলিক নাম হয়। তার বহু বাঁকে মনির জন্ম হয়।

বামুহার জোড়া কালীমন্দির থেকে উত্তরে এক কিলোমিটার দূরে কুলিক নদীর দক্ষিণ পাড়ে ভোন্দাখাড়ি। এক সময় ওই স্থান নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত ছিল। এই খাড়ি লম্বা চওড়ায় বেশ চওড়া বা বড়ো বলে তাকে ভোন্দাখাড়ি বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

উদ্যোগে ১৯৭২ সালে ১৫০টি পরিবার মাছ সংগ্রহের আশায় সেখানে বসতি গড়ে তোলে। সেই সময় তাঁরা জাল দিয়ে কুলিক নদী থেকে প্রচুর মাছ ধরে হাটে বাজারে বিক্রি করতেন। ভোন্দাখাড়ির নদীতীরে বড়ো বড়ো বাঁশের ঝাঁড় ছিল। সেখানে রাতে ডাকাতরা বসে ডাকাতির ছক কষতেন। বেশ কয়েকবার ভোন্দাখাড়ি গ্রামে ডাকাতি হয়। ১৯৮৭ সালে বন্যায় গ্রামের বাড়িঘর ভেঙে পড়ে। বন্যা ও ডাকাতির কারণে মানুষজন সেখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যান।

পিরোজপুরের খাড়ি পতন খাড়ি নামে অভিহিত হয়। বামুহা থেকে বাঁক নিয়ে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে সে দুর্গাপুরে ঢোকে। মনিপাড়ার ওই বদ্বীপে বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে একটি পার্ক তৈরি হয়েছে। সেখানে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা আছে। এক সময় সেখানে একটি বড়ো মনি ছিল বলে ওই স্থান মনিপাড়া নামে অভিহিত হয়। সুভাষগঞ্জের ভিতর দিয়ে এক সময় কুলিক নদী প্রবাহিত হতো। সুভাষগঞ্জ রেললাইন থেকে সুভাষগঞ্জ ঘোষপাড়া যেতে রাস্তার পূর্বপাশে আজও কুলিকের মরা খাত চোখে পড়ে।

রায়গঞ্জ শহরের রামসীতা মন্দির, করুণাময়ী কালীমন্দির, রায়গঞ্জ মর্নিং গার্লস্ হাইস্কুল, বন্দর শ্মশান, পশুপতিনাথ মন্দির, মহারাজা জগদীশনাথ হাইস্কুল, দীপনগর, পদ্মপুকুরের পাশ দিয়ে কুলিক নদী প্রবাহিত হতো। কুলিকের বন্যায় ওই এলাকা প্রায় ডুবে যেত এবং তার ভাঙনে বহু ঘরবাড়ি, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়। তাই ১৯৭৪ সালে রামসীতা মন্দির থেকে সোজাসুজি বন্দর শ্মশান পর্যন্ত মাটি কেটে তার গতিপথকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। সেই মাটি নদীর পাশে ফেলে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এই বাঁধ ও মরা খাতের মধ্যবর্তী স্থানে বন্দর শ্মশান এবং মানুষজনের বেশ কিছু ঘরবাড়ি গড়ে ওঠে। আর মরা অংশে মাছ চাষ করা হয়।

গ্রীষ্মের সময় এই নদীর অন্তিম পথে জলপ্রবাহ খুব কম থাকে। কারণ তার জল জমিতে সেচের জন্য তুলে নেওয়া হয়। বিশাহারে নাগরের সঙ্গে কুলিকের মিলন ঘটে। মোহনায় পলি জমে যাওয়ার ফলে তার গতি কমে যায়। তাই সেখানে প্রচুর কচুরিপানা জমে থাকে। নাগরের জল বাড়লে সেই জল কুলিকের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ২০১৭ সালের বন্যার জল কুলিকের মধ্যে ঢুকে পড়ার ফলে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। এই বন্যায় অনেকের মৃত্যু ঘটে।

রায়গঞ্জে কুলিকের তীরে গড়ে ওঠেছে ১.৩ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কুলিক পাখিরালয়। কুলিক নদীর নাম অনুসারে এই পাখিরালয়ের নামকরণ করা হয়। সেখানে আমলকি, অর্জুন, ইউক্যালিপটাস, কুল, কদম, কাঁঠাল, করঞ্জা, কৃষ্ণচূড়া, খোকসা, গামারি, গুলঞ্চ, ছাতিম, চিকরাশি, জারুল, জিলাপী, ঝাউ, ডমুর, তাল, তেঁতুল, তুঁত, দেবদারু, পেয়ারা, পান্থপাদপ, পিঠালু, মেহগিনি, মীনজিরি, লেবু, বটলব্রাস, বাঁশ, বকুল, শাল, শিমুল, সেগুন, হিজল, লাহি প্রভৃতি ছোটো বড়ো অজস্র গাছ পরিলক্ষিত হয়।

প্রতি বছর মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি এবং সমুদ্র উপকূল থেকে শামুকখোল, বাজকা, ছোটো বক, পানকৌড়ি প্রভৃতি যাযাবর পাখি দলে দলে এই পাখিরালয়ের গাছে এসে আশ্রয় নেয়। তারাও খাদ্যের সন্ধানে কুলিকের জলে বিচরণ করে থাকে। সেখানে গাছে গাছে ডাহুক, বুলবুলি, টিয়া, চড়ুই, শকুনি, পেঁচা, কাঠঠোকরা, মাছরাঙ্গা ও কোকিল দেখা যায়। এই জঙ্গলে ইঁদুর, শৃগাল, বন্য বিড়াল, বেজি, গিরগিটি, বাদুড় ও বিষাক্ত সাপ বসবাস করে। এই কারণে ১৯৮৫ সালে এই পাখিরালয়কে রায়গঞ্জ অভয়ারণ্য বলে ঘোষণা করা হয়। এই পাখিরালয় পরিদর্শনে বহু পর্যটকের আগমন ঘটে। দীপনগরে তার দুধারে প্রচুর ইউক্যালিপটাস, শিমুল, সোনাঝুড়ি গাছ দেখা যায়।

বর্ষাকালে নদী জলে ভরে উঠলে দুই পারের বিশেষ করে শিয়ালডাঙ্গী, ঠাকুরবাড়ি, শেরপুর, বামুহা, আব্দুলঘাটা, সুভাষগঞ্জ, এলেঙ্গিয়া, পাড়ার পুকুর, বিশাহার প্রভৃতি স্থানের মানুষজন নৌকায় আসা যাওয়া করতেন। বামুহা ঘাটে রাজবলি সিংহ এবং তার ছেলে রামপূজন সিংহ প্রায় একশো বছর ধরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নৌকা চালাতেন। নিতাযাত্রীরা নৌকায় পারাপারের জন্য তাঁদেরকে বছর শেষে কেউ টাকা, আবার কেউ ধান দিতেন। রাজবলি সিংয়ের বংশধরেরা ঠাকুরবাড়ি ঘাটে নৌকা চালাতেন। তিনিও বহু গরিব মানুষকে বিনা পয়সায় পার করে দিতেন। তাই তাঁর নামে স্থানের নাম দেওয়া হয় আব্দুলঘাটা।

মোগল আমল থেকে এই নদীপথে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। তার তীরে রায়গঞ্জের বন্দর বাজারে নৌকায় চড়ে দূরদূরান্তের বণিকরা মালপত্র কেনাবেচা করতে আসতেন। বন্দর থেকে প্রচুর পাট রপ্তানি হত এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে নারকেল, গুড় ও সরিষা তেলের আমদানি হতো। তাই রায়গঞ্জে এই নদীর তীরে পাটের গোলা এবং সুদর্শনপুরে নীলকর সাহেবদের কুঠি স্থাপিত হয়। বন্দরে কালীমন্দির, শিবমন্দির, জামা মসজিদ, দেবীনগর কালীমন্দির এবং দীপনগরে পিরের দরগা গড়ে ওঠে। সেখানে মানুষজন পুজো দিয়ে নৌকায় উঠতেন। পরবর্তী কালে শিয়ালডাঙ্গী, ঠাকুরবাড়ী, বামুহা, রায়গঞ্জে একটি করে এবং সুভাষগঞ্জে তার উপরে দুটি সেতু গড়ে ওঠে। তবে সুভাষগঞ্জে একটি সেতুর উপর রেলগাড়ি চলাচল করে। এদের মধ্যে বাহিন পাহাড়পুরের শিয়ালডাঙ্গী সেতু সবচেয়ে বড়ো। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজনের যাতায়াতের অনেক সুবিধে হয়েছে। তবে শেরপুর, এলেঙ্গিয়া, পাড়ার পুকুর ও বিশাহারে এখনও বর্ষাকালে নৌকা চলে। জল কমলে সেখানে বাঁশের মাচা তৈরি করে মানুষজন তার উপর দিয়ে যাতায়াত করেন।

কুলিক নদীর বন্যায় অববাহিকা অঞ্চলে উর্বর পলিমাটির সঞ্চার হয়। তাছাড়াও নদীর তীরবর্তী এলাকায় অনেক রিভার পাম্প ও গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। সেখানে ধান, পাট, ভুট্টা, শাক সবজি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শিয়ালডাঙ্গীতে নদীর মজা অংশে প্রচুর পরিমাণে সরিষা, ভুট্টা, আলু, বেগুন, মূলা প্রভৃতি রবিশস্য উৎপন্ন হয়। বিশেষ করে পাড়ার পুকুরের কুলিক নদীর তীরে প্রচুর বেগুন জন্মায়। মাঘ মাসে তার চড়ে ধানের বীজ বোনা হয়। তার দুই তীরের

মাঠ শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে।

রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বরাবর গ্রামের পাশে কুলিকের এক খাঁড়িকে গঙ্গা কল্পনা করে পয়লা বৈশাখ এলাকার মানুষ স্নান করেন। অধিকাংশই মহিলা। কথিত আছে নাকি, গ্রামের একজন স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই স্নানের সূচনা করেন। খাড়ির পাড়ে সেদিন মেলা বসে। এলাকার মানুষজনের কাছে এই মেলাটি কুমির মেলা নামে পরিচিত।

প্রতি বছর চৈত্র মাসের বাসন্তী অষ্টমীতে ধরুইল ঘাটে গঙ্গাপুজো, নাম সংকীর্তন ও স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ওই দিনে বহু মানুষকে খিচুরি খাওয়ানো হয়। ওই দিনে ঘাটে এলাকার বহু মানুষজন স্নান করেন। ওই দিনে রায়গঞ্জের সন্নিকটে আব্দুলঘাটা গ্রামে কুলিক নদীর স্নানযাত্রাকে কেন্দ্র করে সেখানে গঙ্গাপুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ১৯৫৬ সালে বাসন্তী অষ্টমীর দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্নানযাত্রার সূচনা ঘটে। কারণ বাসন্তী অষ্টমী একটি পবিত্র তিথি। এই তিথিতে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটে। কথিত আছে, চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের বাসন্তী অষ্টমীতে কুলিক নদীর জলে স্নান করলে কোনও শোক হবে না, শরীর ও মন ভালো থাকবে।

কুলিকের শিয়ালমণি জঙ্গলে চণ্ডীতলার ডাক্তার অনন্ত সরকারের উদ্যোগে এবং কিছু ধর্মপ্রাণ স্থানীয় মানুষজনের সহযোগিতায় একটি কালীমন্দির নির্মিত হয়। সেখানে প্রথমে রামপ্রসাদ দাস ওই কালীর পুজো করতেন। কথিত আছে নাকি, এই মন্দিরে ডাকাতরা পুজো দিয়ে ডাকাতি করতে বের হতো। এই কালীমন্দিরে গঙ্গাদেবীরও পুজো হয় এবং মেলাও বসে। তখন সেখানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। ওই স্থানটি খুবই মনোরম এবং আরামদায়ক। প্রচণ্ড গরম পড়লে এলাকার বহু মানুষ সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্রতি বছর মহালয়ার সকালে হেমতাবাদ থানার ঠাকুরবাড়ি ঘাটে, রায়গঞ্জের খোরমুজাঘাটে ও বন্দর ঘাটে কুলিক নদীর কোমর জলে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ তাঁদের পিতৃপুরুষদের আত্মার শান্তির জন্য তর্পণ করে থাকেন। রায়গঞ্জে কার্তিক মাসে কুলিক নদীতে প্রচুর মানুষ ছটপুজো করে থাকেন। নদীঘাটগুলি পরিষ্কার করে সেখানে কলার গাছ পোঁতা হয়। বৈদ্যুতিক আলোয় ঘাটগুলি আলোকিত হয়ে ওঠে। এই পুজো দেখতে বহু মানুষ ভিড় করেন।

চৈত্র মাসের অষ্টমীতে ভিটি ভাতঘরায় কুলিক নদীতে বহু পুণ্যার্থী স্নান করেন। দীপনগরে কুলিক নদীর তীরে গড়ে উঠেছে শিবমন্দির। বহু টাকা ব্যয় করে এই মন্দির নির্মাণ করা হয়। শিব চতুর্দশীর দিনে বহু মানুষ কুলিক নদীর জল নিয়ে মন্দিরের শিবের মাথায় ঢালেন। সেখানে বাসন্তী অষ্টমীর দিনে গঙ্গাপুজো ও স্নানযাত্রার আয়োজন করা হয়। টেনহরি, রূপাহার প্রভৃতি স্থানের মানুষজন স্নানযাত্রায় যোগ দেন। সেদিন সেখানে কবিগানের আসর এবং ছোটো একটি মেলা বসে।

ভিটি গ্রামে নদীর তীরে দুর্গামন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। নদী পার্শ্বস্থ এলাকার বিশেষ করে, বড়বার, বামুহা, পিরোজপুর, আব্দুলঘাটা, কাঞ্চনপল্লী, দীপনগরের মানুষজনের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হলে তাঁরা কুলিকে জল ভরতে যান এবং সেই জল দিয়ে বর-বধূকে স্নান করানো হয়। শেরপুর বারণীতলা শ্মশানে ১৪২২ বঙ্গাব্দ থেকে বাউল উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ওই উৎসবে খ্যাতনামা বাউল শিল্পীরা তাঁদের বাউল সংগীত পরিবেশন করেন।

কুলিক নদীর দুই পাশের বিভিন্ন গ্রামের মানুষজন কৃষিকাজ-সহ আরও কিছু সুযোগ সুবিধে ভোগ করে থাকেন। মুকুন্দপুরে কুলিকের তীরে পঞ্চানন তালুকদারের বাড়িঘর ছিল। দিনাজপুরের মহারাজা পঞ্চানন তালুকদারকে মুকুন্দপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকার জমি পত্তনি দেন। কথিত আছে, তিনি সেই জমির খাজনার টাকা বৎসরান্তে ভাঁড়ে করে দিনাজপুরে মহারাজার বাড়িতে দিয়ে আসতেন। তাঁর উদ্যোগে সেখানে হাট, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শেরপুর, ধরুইল প্রভৃতি গ্রামের মানুষজন কুলিকের জল দিয়ে মহাপ্রভুর ভোগ তৈরি করেন। বহু মানুষ এই নদী থেকে শামুক ও ঝিনুক সংগ্রহ করেন। এই নদীপাড়ের মাটি দিয়ে ইটও গড়া হয়। শীতের সময় বহু মানুষ তার তীরের বিভিন্ন স্থানে বনভোজনে মেতে ওঠে। তাই তারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাকে ত্যাগ করতে পারেননি।

জেলার কবি সাহিত্যিকদের রচনায় কুলিক নদীর স্থান করে নিয়েছে। দেবেশ চক্রবর্তী তাঁর 'ষোল ঘড়ি কথা' উপন্যাসে লিখেছেন, কুলিক পাড়ের কুমোররা কেউ কেউ পৌষ মাসের শেষে হাঁড়ি কলসী বিক্রির জন্য নৌকা যাত্রা শুরু করেন এবং পিঠেপুলির পূর্বে তাঁরা বাড়ি ফেরার আশায় থাকেন'। হয়তো এক সময় পৌষ মাসেও কুলিক নদী জলে ভরে থাকতো। কুলিকের তীরে বামুহা গ্রামে আজও বহু মানুষ হাঁড়ি কলসী তৈরি করেন। মহঃ লাকির কর্ণজোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রেরণা পত্রিকায় উল্লেখ করেন, 'দেখিনু বারে বারে/ কুলিক নদীর ধারে।/ মাছরাঙ্গা আর চিল শকুনি/ উড়ছে তার পাড়ে।/ দেখে আমি আনন্দিত/ কুলিক নদীর রূপ।' আজ এই নদীর জলে পানকৌড়ি, মাছরাঙ্গা, চিল খাবারে সন্ধানে এসে উপস্থিত হয়। তপন চক্রবর্তীর জেলার লোক সঙ্গীত নামের গ্রন্থে কুলিক নদীর কথা উঠে আসে। 'এই জেলাতেই পক্ষী নিবাস/ দেশ বিদেশের পাখির যে বাস/ আবার কুলিক নদীর বেড়া দিয়ে/ পক্ষীরালয় ঘেরা।' এই গানের সুরও তিনি দেন।

বর্তমানে অবৈধভাবে মাটি ও বালি তোলা হচ্ছে। কুলিক নদীর তীরে বহু রিভার পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। সেই সব পাম্প দিয়ে তার দুপাশের জমিতে জল দেওয়া হয়। তাই গ্রীষ্মকালে পাড়ার পুকুর, বিশাহার প্রভৃতি এলাকায় কুলিকের জল প্রায় থাকে না। অচিরেই তা বন্ধ না করলে জেলার অন্যান্য নদীর মতো এই নদীও একদিন হারিয়ে যাবে।

সেই ভাবনায় গড়ে ওঠে কুলিক বাঁচাও কমিটি। কুলিক বাঁচাও কমিটি, পরিবেশপ্রেমী ও শহরবাসীর আবেদন নিবেদনে সাড়া দিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন কুলিক নদী সংস্কারের কাজ শুরু করেছে। কুলিককে বাঁচাতে হবে। কুলিক বাঁচলে উত্তর দিনাজপুর জেলা বেঁচে থাকবে। ■

মেয়েরা নতুন করে স্বপ্ন দেখুক

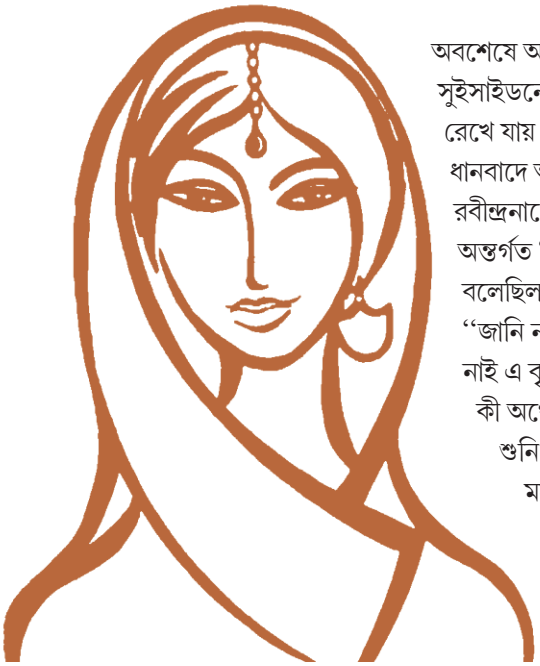

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

গত ৮ মার্চ বিশ্বজুড়ে নারী দিবস পালিত হলো। সেদিনই সুস্মিতা রাজমল্লর নামে বর্ধমানের অন্তর্গত হরিনারায়ণপুরের এক গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিঃশব্দে মারা গেলেন। অভিযোগ, পণের দাবিতে শ্বশুরবাড়ির লোকজন সুস্মিতার উপর অত্যাচার চালাত। কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর সে অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পায়। তাকে খুন করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাদের দাবি, সুস্মিতা আত্মঘাতী হয়েছেন। এসব ঘটনায় আমাদের আর বিস্ময় জাগে না। সারাবছরই তো অনুরূপ ঘটনা ঘটছে। অন্তত নারীদিবসের দিনটিতে বিশ্বের সমস্ত নারী সুখে থাকবে এমন আশা তাই কেউ করে না। বাস্তব পরিস্থিতি আমাদের শিখিয়ে দেয় সে আশা দুরাশা মাত্র। লক্ষণীয়, যেসব বিবাহিতা নারী খুন হন বা আত্মঘাতী হন তাদের শতকরা প্রায় পঁচানব্বই জন আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী নন। নিজস্ব উপার্জন রয়েছে এমন নারীরা সাধারণত আত্মহত্যার পথ বেছে নেন না। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনরাও উপার্জনক্ষম গৃহবধূর উপর অত্যাচার করার সাহস পান না। সম্ভবত সে প্রয়োজনও অনুভব করেন না। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে এমন নারীরা তাই শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার থেকে অনেকাংশে রেহাই পান।

এসব ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে এক বাঙালি তরুণীর কথা, যে মাস-সাতেক পূর্বে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সে উপার্জন করতে চায়নি। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করতে চেয়েছিল। স্বামী তাকে চাকরি করতে বাধ্য করে। স্বামীর কর্মস্থল থেকে অনেক দূরে চাকরি জোগাড় করে দেয়। নিজের অনিচ্ছার কথা সে স্বামীকে বারবার জানিয়েছিল, ফল হয়নি। অবশেষে আত্মঘাতী হয় সেই তরুণী। সুইসাইডনোটে আত্মহত্যার কারণ লিখে রেখে যায়। এর কয়েকমাস পরে ধানবাদে অনুরূপ ঘটনা ঘটে। রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মুক্তি' কবিতার নায়িকা বলেছিল :

"জানি নাই তো আমি যে কী, জানি
নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে, আমি
কেবল জানি—
রাঁধার পরে খাওয়া আবার
খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক চাকাতেই
বাঁধা।"

রাঁধার পরে খাওয়া এবং খাওয়ার পরে রাঁধার জীবনই এই তরুণীদ্বয় চেয়েছিল। কিন্তু পায়নি। অনন্যোপায় হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তাই প্রশ্ন, যেসব নারী চাকরি করতে চায় না তাদের কী হবে? বৈচিত্র্য রয়েছে বলেই তো পৃথিবী এত সুন্দর! কেউ উপার্জন করতে চায়। কেউ বা নিরালা গৃহকোণে থাকতে চায়। যার শখ নির্জনে বসে ছবি আঁকার কিংবা যে তরুণী আশৈশব স্বপ্ন দেখেছে লেখিকা হবে, সে বা তারা চাকরি করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতেই পারে। সমাজেরই প্রয়োজনে তাদের নিজেদের শখ লালন করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

সমস্যার বীজ অনেক গভীরে লুকনো। আমাদের পরিবারে পুত্রসন্তান জন্ম নিলেই অতিশয় যত্নে লালন করা হয়। সে শৈশব হতে দেখে তার ইচ্ছেতেই সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর কন্যা সন্তান জেনে যায় যে এ বাড়ি ছেড়ে তাকে একদিন চলে যেতে হবে। পিতৃগৃহ তার নিজের গৃহ নয়।

সন্তানের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব জননীকেই নিতে হবে। পুত্রসন্তানের মধ্যে এই বোধ জাগাতে হবে যে তার ইচ্ছেয় সমস্তকিছু নিয়ন্ত্রিত হবে না। তার জীবনসঙ্গিনীর জীবনও নয়। সে চাকরি করবে কি করবে না সে সিদ্ধান্ত সেই নেবে। কন্যাসন্তান পিতৃগৃহ থেকে বিদায়ের আগে যেন এই পরম আশার বাণী শোনে যে এ বাড়ির দরজা তার জন্য চিরকাল খোলা থাকবে। সে স্বপ্ন দেখুক। সে স্বপ্ন পূরণে বাধা এলে আত্মহননের পথ বেছে না নিয়ে যেন সে এ বাড়িতে ফিরে আসে। নতুন করে জীবন শুরু করে। ■

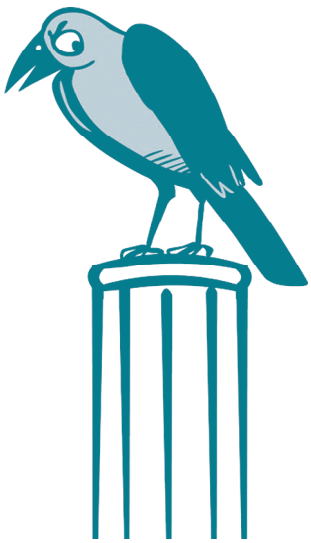

নব অবতারে হরি ঘোষের গোয়াল

ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক। এই মহতী বাণী আমাদের জীবনে এক অমোঘ সত্যরূপে দেখা দিয়েছে। ফলে সারাজীবন এই সংগ্রামের পাঁয়তারা দেখতে দেখতেই এখন বুঝি শেষের সেদিন ভীষণ ভয়ঙ্কর ঘনিয়ে আসছে। আগে এটি বামপন্থী সংগ্রামীদের একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল কিন্তু কালক্রমে এই সংগ্রামী চেতনা সকলের মধ্যেই বেশ ব্যাপ্তিলাভ করেছে।

এমনকী এই চমৎকৃত ধাপ্পা দিয়ে যখন বামপন্থী বুজরুকরা বঙ্গদেশে মসনদ দখল করল, তখন এই বাণীর নবরূপে তাঁরা চালু করলেন 'সংগ্রামের হাতিয়ার বামফ্রন্ট সরকার।' কিন্তু বামপন্থী মোড়লদের মৌরসিপাট্টায় যখন মারদাঙ্গা, লুঠমার, খুন-ধর্ষণ, ছাপ্পা-রিগিং করতে করতে সংগ্রামের হাতিয়ারটি ভোঁতা মেরে গেল, তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থা। ফলে ত্রিপুরার লাল দুর্গটিও অবশেষে তাসের প্রাসাদের মতো ভেঙে পড়ল। এখন তাই সংসদে সংগ্রামী ভরসা। এই মুখেন মারিতং সংগ্রাম, বর্তমান সংসদকে আক্ষরিক অর্থে একটি অকর্মণ্যদের হরি ঘোষের গোয়াল করে তুলেছে। পার্টির গোপালরা গোমূর্খ ও এই গোয়ালের দেখভাল করতে ব্যস্ত। ন চ মূর্খেন মিত্রতা কথাটি সংসদে এখন বাতিল।

ইস্কুলে আমাদের স্বাস্থ্য বইয়ে ছিল কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধির কথা। সেটি শুধু ব্যক্তিস্বাস্থ্যের পক্ষেই নয়, সামাজিক স্বাস্থ্য তথা দেশের স্বাস্থ্যের পক্ষেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই এই সংক্রামক সংগ্রামী জিগির এখন সব দলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে মহান সংসদে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। সংসদ তো জনজীবনের প্রতিনিধি নিয়েই তৈরি। সুতরাং জনগণের সংগ্রামী ইস্পিরিট এখন সংসদে মহীয়ান। আসলে রাস্তার রাজনীতি করে যেসব মহাজনরা বাহুবলের চোটে নির্বাচিত হয়ে জেলের অমাননীয় অবস্থা থেকে মহান সংসদে গিয়ে মাননীয় হন, তাঁরা কিন্তু মোটেই তাঁদের স্বভাব ছাড়তে পারেন না। আর তাঁদের দোষ দিয়ে লাভ কী, কথাতেই তো আছে স্বভাব যায় না মলে, ইল্লত যায় না ধুলে। স্বভাব আর ইল্লতের ওপর ভর করে যাঁরা মহান সংসদের সদস্য হন তাঁদের কাছে পরিবর্তন আশা করা বৃথা। আমরা কি কলেজে পড়িনি Can a leopard change its sport.

মাননীয় সাংসদদের বসবার জন্যে সংসদভবনে গদি আঁটা আরাম কেদারা থাকলেও, সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ একশ্রেণী হঠাৎ কবিগুরুর লাইন আউড়ে বলে ওঠেন, 'আরাম হতে ছিন্ন করে, সেই 'ওয়েলে' লও গো মোরে, অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান'। তাই দেখি মহান সংসদের বাজেট অধিবেশনে গত একপক্ষ কাল ধরে উভয়কক্ষে এই সংগ্রামের ড্রামাবাজি চলছে। বেহায়ার আবার লজ্জা কী! আর কে না জানে, লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিন থাকতে নয়। অন্তত সাংসদের পক্ষে তো নয়ই।

অবশ্য সকলেই যে একই ধারার অনুবর্তী তা বলা যায় না। এটি নাকি বিরোধী রাজনীতির একাগ্নি অস্ত্র। গদি হারানোর শোক ভুলতে না পেরে, এনারা একটা না একটা ছুতো করে জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে চেঁচিয়ে সংসদকক্ষ মাত করে ডেলি অ্যালাউন্স আর পার্লামেন্ট ক্যান্টিনে বিনা পয়সার ভোজ খেতে খেতে এরিয়া ডেভেলপমেন্টের ডিলের ব্যবস্থা করে সগৌরবে নিষ্ক্রমণ করেন। কেননা সংখ্যায় শক্তিহীন বিরোধীপক্ষের একমাত্র অস্ত্র--- লণ্ডভণ্ড করে দে মা লুটে পুটে খাই।

লোকসভার স্পিকার ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সভায় আলোচনার জন্য তৎপর হলেও, কে শোনে কার কথা। সংসদীয় কার্যাবলীর সংবিধানসম্মতভাবে চালানোর জন্যে স্পিকার মহোদয়া সম্প্রতি সংসদের সেন্ট্রাল হলে একটি দুদিনব্যাপী সর্বদলীয় লেজিসলেটিভ কনফারেন্সের আয়োজন করেন। সেখানে উপস্থিত সাংসদমণ্ডলী অবশ্য সভ্য হয়ে সমস্ত কিছু শুনলেও সভ্যতার প্রতি যে তেনাদের প্রবল অনীহা তা তখন বোঝা যায়নি। আরে চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনি!

আসলে যে বিসিমিল্লায় গলদ। এটাই লোকসভার স্পিকার মহোদয়া হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। যদিও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সংসদ ও সাংসদের ভূমিকা সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জলভাবে বিশেষিত করে বলেন, সংসদের মূল লক্ষ্য--- গভর্নমেন্ট প্রোপোজেস, অপোজিশন অপোজেস এবং পার্লামেন্ট ডিসপোজেস। কিন্তু মুশকিল হয়েছে অপোজ করতে গেলে একটু বিদ্যেবুদ্ধি, যুক্তিতর্কের ক্ষমতার প্রয়োজন। রাস্তায় রাস্তায় রাজনীতি করতে গিয়ে বাহুবলীদের ওগুলোর ধারে কাছে যাওয়ার অবসর হয়নি। তাই স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ। পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে তাহলে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে। সংসদ যদি রাস্তায় নেমে আসতে না পারে, তাহলে সংসদকেই রাস্তা বানিয়ে সেখানে চেল্লাচেল্লির ডুগডুগি বাজিয়ে বাজিমাত করতে হবে।

সরকার ও বিরোধীপক্ষ উভয়কে নিয়েই পার্লামেন্ট। তাই ব্রিটেনে বিরোধী পক্ষকে বলে হার ম্যাজেস্টিস অপোজিশন। পার্লামেন্টে সরকার ও বিরোধীপক্ষের যুক্তিতর্ক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় জনগণের স্বার্থে। এই ব্যবস্থা ভারতে বহুদিন ধরে

গ্রামসভার মাধ্যমে হয়ে আসছে। তারই উন্নততর সংস্করণ সংসদীয় ব্যবস্থা।

জনগণের কল্যাণে আগেকার দিনের রাজার মতো বা পরবর্তীকালের ডিক্টেটরদের মতো যো-খুশ ফতোয়া জারি না করে, বহুজনের আলোচনার পর সর্বসম্মত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণই সংসদীয় গণতন্ত্রের সর্বোত্তম পন্থা। কিন্তু সেখানে বিরোধীপক্ষের 'Dog in the manger' পলিসি, না ঘাটকা, না ঘরকা অবস্থায় টেনে আনে। সেই অচলাবস্থাতেই শেষ করিয়ে নিতে হয়। আসলে আলোচনা যত না হয়, ততই ভালো। কেননা 'মূর্খ তাবচ্চ শোভতে যাবৎ ন ভাষতে'। আসলে অস্বীকার করার উপায় নেই, আমাদের অধিকাংশ নির্বাচিত সভাতেই মূর্খের মিছিল। সংসদও তার ব্যতিক্রম নয়। সভার আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য যে ন্যূনতম যোগ্যতার প্রয়োজন, তা অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাই প্রত্যেক দলেই যে সদস্যদের সংখ্যা পাওয়া যায়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শূন্যির দল। একজন মুখপাত্র মুখ খোলার পর তারা হলেন হাত তোলার দলে। অধিকাংশই নীরব কবির গড্ডলিকা প্রবাহের ধারায় অভিষিক্ত। আগেকার দিনে মাতব্বরা ঘাড় নাড়া মোসাহেব পুষতেন, এখন রাজনৈতিক দলে, চড়কডাঙার সেই ঘাড়নাড়া পুতুলের সমারোহ। সুতরাং আলাপ আলোচনা যত কম হয়, ততই ভালো এবং এই মূর্খের মিছিলকে পার্টি হুইপ দিয়ে এককাট্টা করাই একমাত্র সংসদীয় পন্থা।

ব্রিটিশ ধাঁচে আমাদের ভারতীয় সংসদ যখন আরম্ভ হয়, তখন সেখানে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবানদের সমাবেশে সকলেরই নিজস্ব চিন্তাধারায় উজ্জ্বল প্রতীতীঋদ্ধ মতামতের অবদান ছিল। দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের কংগ্রেস প্লাটফর্মে, বিশেষ বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঐতিহ্যটিই পরে বুদ্ধিদীপ্ত সংসদে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু মহীয়সী ইন্দিরা গান্ধী, জাতি গঠনে অনেক ভালো কাজ করা সত্ত্বেও তাঁর স্বৈরতন্ত্রী স্বভাবে একচ্ছত্র অধিকার লাভের প্রবল প্রয়াসে যে লুম্পেন রাজনীতির আমদানি করেন, তার ফলেই বাহুবলী প্রতারক প্রবঞ্চকরা রাজনীতির আখড়ায় মুখ্য হয়ে ওঠে।

ফলে শিক্ষিত, বিদ্বান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্বাধীনচেতা রাজনীতিকদের বদলে আবির্ভূত হয় অশিক্ষিত, পেশি আস্ফালনকারী, চোর জোচ্চোর, ছ্যাঁচোড় ও খুন-ধর্ষণের মতো অপরাধে অভিযুক্ত লোকেরা রাজনীতির জগতে মাতব্বর হয়ে ওঠে।

প্রকাশিত তথ্য থেকেই জানা যায়, বর্তমান সংসদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল চার্জের অভিযোগ আছে। এরা হাসিমুখে ধরা পড়ে তিহার জেলে গিয়ে হাফু গাইছেন; আবার আইনের কূটকাচালিতে বেরিয়ে এসে সংসদ আলোকিত করছেন। বিহারের মহান যাদবকুলপতি পশুপতি বা তাঁর চেলা কুতুবুদ্দিন জেলে যাচ্ছেন আবার ফাঁক পেলেই বৈপ্লবিক বাণী ঝাড়ছেন। আর তার সহায়ক হয়েছে আমাদের দীর্ঘসূত্রী অতি বুদ্ধিমান বিচার ব্যবস্থা। তাই আইনের মারপ্যাঁচে জয়ললিতা একবার জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন, আবার জেলে যাওয়ার আগে মারা যাওয়ার ফলে সখী শশীকলাকে জেলের ঘানি টানতে হচ্ছে।

আসলে অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দেশে মহান সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও, আইনের ফাঁক দিয়ে তার বিষময় ফলটিই আমাদের গণতন্ত্রের বিশেষত্ব হয়ে উঠেছে। প্রকাশ্যে ভোট লুঠ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, নির্বাচনে টাকার খেলা এমনকী নির্বাচিত পদলাভেও টাকার খেলা অবাধে চলছে। মদবেচা চাঁদির জুতো মেরে বিজয় মালিয়া এমপি হন এবং সেই ব্যবস্থাটি এখন একটি অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংসদ থেকে আরম্ভ করে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে এখন প্রকাশ্যভাবে চলছে টাকার খেলা। খালি মূল্যের হেরফেরে পদের তারতম্য। এবং নোটের তাড়ার মহিমায় গাঁটকাটা থেকে গুণ্ডাপাণ্ডা কারোরই নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যায় না, এমনই আমাদের মহান বিধান। তবে সুযোগ বুঝে গণতন্ত্রের ডাকে এককাট্টা হতে যে মহান সাংসদরা কার্পণ্য করেন না তার প্রমাণও বিরল নয়। সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে সভা বানচাল করার মাঝেই যদি সাংসদদের বেতন বৃদ্ধির কথা হয়, তাহলে সব পক্ষই দেখা যায় এক জাতি, এক প্রাণ একতা। অবশ্য এই সাংসদ ভাতার মহিমা এমনই যে, কাজ কর না কর, মাইনে তো বটেই এমনকী বিশেষ বোনাস প্রাপ্তির কোনও হানি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজ না করে বোনাস পাওয়া দেশে মার্কসবাদী অর্থনীতির এক মহান অবদান। কিংবা অফিস অফ প্রফিট বিলের মতো বাঁচবার প্রক্রিয়ায় সিপিএম সোমনাথ থেকে বোফর্সসতী সোনিয়া সকলেই একপায়ে খাড়া। তখনই সংসদীয় 'ঐক্য' যুগ যুগ জিও রবে উত্তাল হয়ে ওঠে। আর তখনই সংসদ প্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধীর মর্মর মূর্তিতেও হৃৎকম্প দেখা দেয়। ■

স্বস্তিকা ৭০ বছর পূর্তি

ও

বাংলা নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান

১৪ এপ্রিল ২০১৮ (বাংলা ৩০শে চৈত্র, ১৪২৪) শনিবার

স্থান : সুবর্ণ বণিক সমাজ হল

৪৭, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩

সময় : বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট

স্বস্তিকার লেখক, পাঠক-পাঠিকা, প্রচার প্রতিনিধি, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

সজিনায় বসন্তের প্রতিকার

সত্যানন্দ গুহ।। সজিনা, সজনে বা সাজনা নানা নামে একটি মুখরোচক ও উপকারী সুখাদ্য। গাছের ডাঁটা, পাতা, ফুল, ফল সবই সুপথ্য। এর ভেষজগুণ প্রচুর। নরম ডালপালা যুক্ত বহুবর্ষজীবী গাছটি গ্রামগঞ্জের সর্বত্র অবহেলায় জন্ম নেয়। বাড়ির বেড়ায় বিশেষত শোভা পায়। যে কোনও তরকারিতে কয়েক টুকরো সজনে ফেলে দিয়ে মুখরোচক হয়। খেতে বসলে যাদের অরুচি বোধ হয়, তাদের মুখে রুচি ফিরে আসবে।

উপকারিতা : রুচি ফেরাতে, বাত, শ্লেষ্মা, চক্ষুরোগ, ব্রণ, প্লীহা, গলগণ্ড, বায়ু, পিত্ত, কৃমি নাশে বিশেষ উপকারী। সজনে বীজের তেলে কটুরস, কফ, বায়ু, ব্রণ, শোথ নাশ হয়। পৌষ থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত ফুল ও ডাঁটা পাওয়া যায়। 'নাজনা' নামে অন্য একটি ফল বারো মাসই পাওয়া যায়। সবুজপাতা ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস সমৃদ্ধ সজনে মূলা, বিট, গাজর, শুটির চেয়েও উপকারী। সজনের ডাঁটায় প্রচুর ফসফরাস, আয়রন, ভিটামিন এ ও সি আছে। এর প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ফুল ফল বসন্ত রোগের শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধক। বাতের রোগীদের সজনে ছাল বেটে খাওয়া উচিত এবং বাতের স্থানে ছাল বাটা বেঁধে রাখলে রোগ দূর হয়ে যায়। এই ওষুধি যুক্ত বৃক্ষটির মূল না খাওয়াই ভাল (বিষাক্ত)।

সজনে গাছের শিকড় থেকে পাতা, ফুল, ডাঁটা, বীজ, ছাল সবই উপকারী।

কী কী রোগ দূর করে : পাতার শাক, ফুলের ঝোল বা ভাজা খেলে শরীর মজবুত হয়। গর্ভবতী নারীদের রক্তাল্পতা দূর হয়। বসন্তরোগ দূর হবে। হলুদ হয়ে যাওয়া পাতার রস আহারের পূর্বে খেলে হাইপ্রেসার ভাল হয়। কোথাও আঘাত লাগলে পাতার রস লাগালে ভাল হয়। হিক্কা উঠলে পাতার রস ৪/৫ ফোঁটা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে ২/৩ বার খেতে হবে। সজনেপাতা ফুটানো জলে মাড়ি ফোলা ও ব্যথা কমে। টিউমারে পাতা বেটে লাগাতে হয়। সর্দিজ্বরে পাতার ঝোল উপকার। সজনের বীজ থেকেই খড়ির তেল তৈরি হয়। যকৃত ও প্লীহা রোগে শুক্‌নো ফুল ব্যবহার হয়। গাছের ছাল (ত্বক) বেটে খেলে বাত রোগের বিশেষ উপকার, ব্যথা বেদনায় উপশম দেয়। অন্ধত্বেও বিশেষ কাজ হয়।

উপাদান :

ভারতের জাতীয় পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে— প্রতি ১০০ গ্রাম পাতায় থাকে : ৬.৭ গ্রাম প্রোটিন, ১.৭ গ্রাম ফ্যাট, ২.৩ গ্রাম খনিজ লবণ, ১৩.৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৪৪০ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম, ৭০ মিটার গ্রাম ফসফরাস, ৭ মিলি গ্রাম ফসফরাস, ৭ মিলি গ্রাম আয়রন, ৬৭০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন, ২২০ মিলি গ্রাম ভিটামিন সি, ০.৯ গ্রাম ডায়াটারি ফাইবার আছে। শক্তি ৯৬ ক্যালরি।

ফুলের মধ্যেও প্রোটিন (৩.৬ গ্রাম) ফ্যাট (০.৬ গ্রাম), খনিজ লবণ (১.৩ গ্রাম), কর্বোহাইড্রেট (৭.১ গ্রাম), ক্যালসিয়াম ৫১ (মিলি গ্রাম), ফসফরাস ৯০ (মিলি গ্রাম),

ডায়াটরি ফাইবার (১.৩ গ্রাম) পাওয়া যায়। ডাঁটার মধ্যেও উক্ত জিনিস ছাড়াও ফসফরাস, আয়রন, ক্যারোটিন, ভিটামিন সি বেশি মাত্রায় থাকে। এমাইনো অ্যাসিড বিশেষ উপকার করে। 'এ' ভিটামিন (ক্যারোটিন) থাকায় অন্ধত্ব নিবারণ হয়।

(লেখক প্রাকৃতিক চিকিৎসক)

শরীরে বুলেটের দাগ চোখে নতুন যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঘটনাটা সম্ভবত এখনও অনেকে মনে রেখেছেন। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের সময় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ বাহিনীর এক কম্যান্ডান্ট চেতন কুমার চিতা মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। তার শরীরের মোট ন'টি গুলি লেগেছিল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর টানা কয়েক মাসের যমে-মানুষে টানাটানি। কোমায় চলে যাওয়া চেতনকুমার কোনওদিনই আর সুস্থ হবেন না, এটাই

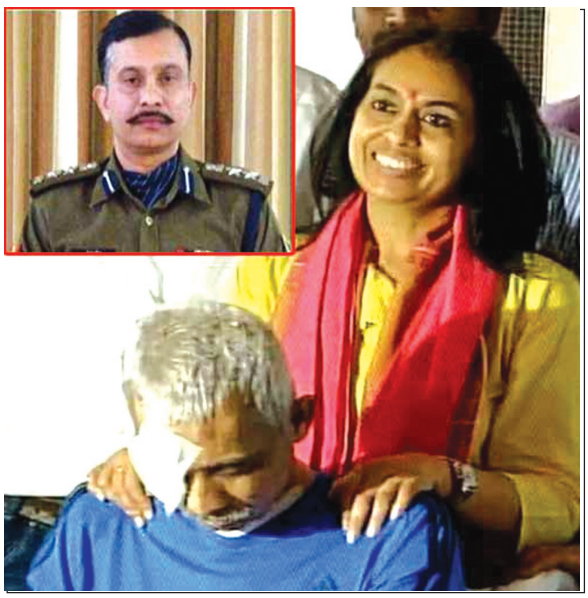

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন চিতা (ছইল চেয়ারে)। ইনসেটে ইউনিফর্মে চিতা।

সকলে ধরে নিয়েছিল। ন্যায়যুদ্ধের যোদ্ধাদের যিনি সর্বশেষ রক্ষক তিনি সম্ভবত অন্য কথা ভেবেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব সেখান থেকে তাঁকে ফিরিয়ে এনে এগিয়ে দিয়েছেন সেইদিকে, যেখানে একজন যোদ্ধার থাকার কথা। হ্যাঁ, চেতন কুমার চিতা আবার কাজে যোগ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কথাপ্রসঙ্গে চেতনকুমার জানিয়েছেন তিনি আবার যুদ্ধে যেতে চান। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করতে চান দেশকে।

ভারতবর্ষে বীরপুরুষের অভাব কোনওকালেই ছিল না। ক্লাস ফোরের কোনও বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলে সেও পুরু, শিবাজী, নেতাজী বা ভগৎ সিংহের নাম বলে দেবে। কিন্তু এখনকার সময়টাই একটু গোলমেলে। এখন যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দেন তাদের কাছে সেনার কাজ মানে সেনার পেশা। সেনাবাহিনীতে থাকলে কত টাকা পাবেন, কী কী পদোন্নতি ঘটবে এসবই অধিকাংশের বিবেচ্য। সেই দিক থেকে বিচার করলে দায়বদ্ধতার নিরিখে বীরপুরুষ আজকাল সংখ্যায় অল্প। চেতনকুমার সেই কারণেই অনন্য। নয়তো ডান চোখে ব্যান্ডেজ (এখনও বুলেটের ঘা শুকোয়নি) নিয়ে তিনি বলতে পারতেন না, 'ডিউটিতে যোগ দিতে পেরেছি বলে আমি গর্বিত। চেনা জায়গায় ফিরতে পেরে দারুণ লাগছে।'

চেতনকুমারের দায়বদ্ধতার উদাহরণ এখানেই শেষ নয়। তবে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে জেনে নেওয়া দরকার গত বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি ঠিক কী ঘটেছিল। এদিন ভারতীয় সেনা কাশ্মীরের বান্দিপুরার হাজিন অঞ্চলে কয়েকজন জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল। এই সময় সেনাকে লক্ষ্য করে জঙ্গিরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। ৪৫নং ব্যাটেনিয়নের কম্যান্ডান্ট চেতন কুমার চিতা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং কয়েকঘণ্টা গুলিযুদ্ধের পর জঙ্গিদের গুলিতে লুটিয়ে পড়েন।

চেতনকুমারের সাহস, দেশপ্রেম এবং প্রাণের মায়া ত্যাগ করে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকে সম্মান জানাতে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে কীর্তি চক্র প্রদান করেছে। একজন সৈনিকের কাছে এ এক বিরল সম্মান। অভিভূত চেতনকুমার বলেন, 'আমি চাই দেশের নবীন প্রজন্ম দেশের জন্য তাদের একশো শতাংশ দিক। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমি সেটাই করেছি। আমাকে যে ডিউটি দেওয়া হয়েছিল, জঙ্গিদের গুলির রেঞ্জ থেকে পালিয়ে গিয়েও আমি তা করতে পারতাম। কিন্তু তা না করে আমি গুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। শুধু দেশের জন্য।' মুখের ওপর সত্যি কথা বলতে ভয় পান না চেতন। বলে দেন, 'একটু সময় লাগবে ঠিকই কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমার মতো একজন সৈনিক এইটুকুই করতে পারে। এরপর প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছার।' এক বছর তিনি হাসপাতালে কাটিয়েছেন। এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি। তবুও তিনি বলেন, 'কাশ্মীর সমস্যার সামরিক সমাধানই একমাত্র সমাধান।'

কিন্তু চেতনকুমারের পরিবার কী বলে? তাঁরাও কি দেশের জন্য সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার পক্ষে? একথা ঠিক চেতনকুমারের স্ত্রী উমা সিংহ স্বামীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু তাই বলে দায়বদ্ধতার দিক থেকে কম যান না। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা যারা পাথর ছোঁড়ে তাদের দেশপ্রেমিক বলায় তার প্রতিবাদ করেছেন উমা। তিনি সরাসরি ফারুক আবদুল্লাকে প্রশ্ন করেন, 'যারা পাথর ছোড়ে তারা যদি দেশপ্রেমিক হয় তাহলে দেশদ্রোহী কারা?' তিনি আরও বলেন, 'যারা পাথ ছোঁড়ে তারাই আমাদের সেনার কাছে সব থেকে বড়ো বাধা। তাদের জন্যই কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরছে না।'

নিঃসন্দেহে দু'জনের একেবারে রাজযোটক মিল। দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এমন কিছু দু'জনের কেউই ভাবতে রাজি নন। চেতনকুমারের শরীরে বুলেটের দাগগুলো দেখে কি উমার কষ্ট হয়? হয়, নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু সেই কষ্টের সঙ্গী হয়ে আসে গর্ব। তখন দাগগুলো উমার অলংকার হয়ে যায়। মেয়েরা গয়না পরতে ভালোবাসে। কিন্তু উমার প্রথাগত গয়না নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই। চেতনকুমারের স্ত্রী বলেই তিনি এমন রূপসী। আর সে কথা সারা দেশ জানে। ■

ভারতীয় নারীর আদর্শ মেরিকম

বক্সার মেরি কম সব অর্থেই 'ডাউন টু আর্থ'। এতগুলি বিশ্বখেতাবের অধিকারী হয়েও মাটির মানুষ। দেশজ শিকড়ের গভীরে গিয়ে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে সেবা করে চলেছেন ভারতীয় বক্সিংয়ের। তার হাত ধরেই নবজাগরণ হবে ভারতবর্ষের বক্সিংয়ে। খোলামেলা সাক্ষাৎকারে তার বলিষ্ঠ মননের খোঁজ পাওয়া গেল।

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন : মেরি কম নিজেই এক প্রতিষ্ঠান, কেমন উপলব্ধি করছেন?

মেরিকম : আমি যে অ্যাকশনধর্মী খেলায় আসব এমন কোনও পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা ছিল না। আসলে আমার যখন শৈশব-কৈশোরের সন্ধিক্ষণপর্ব তখন থেকেই মণিপুর ভারতের ক্রীড়া মানচিত্রে এক উজ্জ্বল বিন্দু হয়ে ফুটে উঠছে। তাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমিও খেলার জগতে চলে আসি। লেখাপড়ার পাশাপাশি ব্যায়াম, বক্সিং, ক্যারাটে সবই চালু হয়ে যায় স্কুলে। ১৯৯৮-তে ডিঙ্কো সিংহ ব্যাঙ্কক এশিয়াডে সোনা পেলেন আর গোটা মণিপুর জুড়েই তুমুল আগ্রহ, উন্মাদনা তৈরি হলো বক্সিংকে ঘিরে। আমার তখন ১৭ বছর বয়স। ঠিক করে ফেলি সব খেলা ছেড়ে এই বক্সিংই হবে আমার জীবন-জীবিকার সংস্থান। তারপর একে একে জাতীয় চাম্পিয়ন হই, বিশ্বখেতাব করায়ত্ত করি, এশিয়াডে সোনাও পেয়ে গেলাম। এখন যেন মনে হয় এক স্বপ্ন-সুন্দর জগতে বিচরণ করছি।

প্রশ্ন : প্রথম কোচ কে এবং সেরা কোচ কাকে মনে করেন?

মেরিকম : আমি বাবা-মাকে না জানিয়েই ইম্ফলের বক্সিং অ্যাকাডেমিতে যাই এবং সৌভাগ্যক্রমে সেখানে ইবোমোচা সিংহকে পেয়ে যাই। গ্রাসরুট লেভেলে তাঁর মতো কোচ তখন গোটা দেশেই খুব কম ছিল। একজন নবীন, প্রতিশ্রুতিমান বক্সারকে কীভাবে উন্নত ট্রেনিং এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে রিংয়ে নামাতে হয় তা ইবোমোচা সিংহকে দেখেই শিখেছি। আজ আমার অ্যাকাডেমিতে যেসব কোচ আছেন তাঁদের ইবোমোচা সিংহের ট্রেনিংপদ্ধতি মেনে চলতে বলি। আর পরিশীলিত বয়সে পেয়েছি বিখ্যাত কিউবান কোচ লুই ফার্নান্ডেজকে। তিনিই আমাকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি দুনিয়ার অন্যতম সেরা কোচ।

প্রশ্ন : কোন বিশ্বখেতাবটা সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক?

মেরিকম : প্রথম যেবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হই সেই খেতাবটা। ২০০২ সালে তুরস্কে অনুষ্ঠিত বিশ্বমিটে একেবারে আনকোরা হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। তার আগে খুব একটা আন্তর্জাতিক এক্সপোজার ছিল না। কিউবা, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্ব বক্সিংয়ে সব বড় শক্তি। এইসব দেশের বক্সাররা প্রচুর বড় বড় ইভেন্ট করে এসেছে।

সবচেয়ে উন্নত ট্রেনিং করে, প্রচুর সুযোগ সুবিধে প্রাপ্ত হয়ে তুরস্ক এসেছে। আর আমি দুর্বল গরিব দেশের অকিঞ্চিৎকর প্রতিনিধি হয়ে গেছি। বাস্তবে দেখা গেল এই দুর্ভাগা দেশের অজেয় ফাইটারই সবাইকে টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেল। ওই খেতাবটাই আমাকে চাগিয়ে দিয়েছিল। জীবনের চেয়েও বড় কিছু করে দেখাতে আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুরস্কের বিশ্ব খেতাবটি। এরপর ক্রমান্বয়ে নরওয়ে রাশিয়া, ডেনমার্ক, কাজাখিস্থানে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বিশ্বকাপ বা চ্যাম্পিয়নশিপে পোডিয়ামের সবচেয়ে উঁচু ধাপে দাঁড়িয়েছি।

প্রশ্ন : এখনো কোন স্বপ্নটি অপূর্ণ রয়ে গেছে?

মেরিকম : একাধিকবার বিশ্বখেতাব জিতেছি। সোনা এসেছে এশিয়াড থেকে। রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছি রাষ্ট্রপতির মনোনীত প্রার্থী হয়ে। নিজের রাজ্যে সাংসদের টাকায় অ্যাকাডেমি করেছি। অর্জুন, পদ্মশ্রী পেয়েছি, আমার জীবন অবলম্বনে বলিউডে সফল ছবি হয়েছে। কিন্তু গ্রেটেস্ট শো অ্যান্ড ফেস্টিভাল অন ইউনিভার্স থেকে সোনা আনতে পারিনি। আমার দেশ থেকেও কোনও লড়াকু বক্সার উঠে আসেননি যিনি এই মহাজাগতিক কীর্তির অধিকারী হতে পারেন। জীবদ্দশায় এই স্বর্গীয় দৃশ্যটি দেখে যেতে চাই। বিজেন্দর সিংহ পেশাদার বক্সিংয়ে এসে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত। এশিয়া-প্যাসিফিক এবং এশিয়-ওশেনিয়া খেতাবধারী। ওর মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা আছে বিশ্ব পেশাদার খেতাবজয়ী হবার। তাহলে ভারতীয় বক্সিংও আন্তর্জাতিক পটভূমিতে এক বৈপ্লবিক যাত্রাপথের শরিক হবে অন্যান্য উন্নত দেশের মতো। ■

গল্প

দুই ডাকাত ও একটি মেয়ে

তখন সন্ধে হয়েছে সবে। অন্ধকার নামেনি। বাঁশবনের আড়ালে চাঁদ উঠেছে। বড় বড় পাঁচখানি নৌকা নিয়ে ডাকাতি করতে চলেছে দুই ভাই। ডাকাত হিসেবে দশ গাঁয়ে পরিচিতি আছে দুই ভাইয়ের। নৌকাগুলি এক গ্রামের কাছে এসে ভিড়লো। নৌকা থেকে নেমে সাঙ্গপাঙ্গরা সব ছুটলো গ্রামের দিকে খোঁজখবর নিতে। দুই ডাকাত ভাই বসে আছে নৌকায়। বিশাল চেহারা, গায়ের রঙ কালো, পাকানো গোঁফ। চারদিকে তাকিয়ে দেখছে তারা। হঠাৎ এক ভাইয়ের চোখে পড়লো কাছেই নদীর ধারে একটি ভাঙা মন্দিরের চাতালে বসে কাঁদছে একটি মেয়ে। বয়স হবে ষোলো-সতেরো। এক ভাই নৌকা থেকে নেমে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? কাঁদছো কেন?

মেয়েটি অচেনা লোককে দেখে একটু ভয় পেল। ভয়ে ভয়ে বলল, পাশের গায়েই আমার বাড়ি। আমার বাবা এক বুড়োর সঙ্গে আমার আজ বিয়ে দিচ্ছে। তাই আমি পালিয়ে এসেছি।

ডাকাত বলল, তুমি বুড়োকে বিয়ে করতে চাও না?

মেয়েটি বলল, না।

ডাকাতটি বলল, তাহলে তুমি এখন কোথায় যাবে?

মেয়েটি চোখের জল মুছে বলল, তুমি তো আমার বাবার মতো। তুমি আমাকে বাঁচাও।

ডাকাত তখন মেয়েটিকে নৌকায় নিয়ে এল। মেয়েটি তখনো জানতো না যে সে ডাকাতের নৌকায় উঠেছে।

নৌকায় উঠে মেয়েটি বলল, আমাদের গাঁয়ে এক ছেলে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, কিন্তু ওর বাবা, আমার বাবা কেউ এই বিয়েতে রাজি নয়। তাই জোর করে এক বুড়োর সঙ্গে আজ আমার বিয়ে দিচ্ছে।

দুই ডাকাত ভাই একে অপরের দিকে চাইলো। এক ডাকাত বলল, তুমি সেই ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি?

মেয়েটি লাজুক ভাবে ঘাড় নাড়লো। ডাকাত জিজ্ঞেস করলো, ছেলেটির নাম জানো?

মেয়েটির সেই ছেলের নাম বলল। ডাকাত তখন এক লেঠেলকে হুকুম করলো সেই ছেলেকে ধরে আনতে। কিছুক্ষণের মধ্যে লেঠেল ছেলেটিকে ধরে আনলো। ডাকাত হাঁক দিয়ে সবাইকে বলল, আজ আর ডাকাতি করতে যাবো না। এই মেয়েটি আমাকে বাবা বলেছে। তাই আজ আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব।

নৌকা আবার ফিরে চলল।

ডাকাত দুই ভাই পেশায় ডাকাত হলেও মনে বেশ দয়ামায়া আছে। অতিথি আপ্যায়ন করে। ব্রাহ্মণ সেবা করায়। তারা সাঙ্গপাঙ্গদের বলল, বাড়ি গিয়ে এক্ষুণি বিয়ের সব ব্যবস্থা কর। গ্রামের সবাইকে ডাক, ভোজের ব্যবস্থা কর।

সেই রাতের মধ্যেই বিয়ের সব ব্যবস্থা হলো, পুরুতমশাই এলেন, বিয়ে হলো। মেয়েকে যথারীতি সাজিয়ে দিল দুই ভাই। সোনার অলঙ্কার, বাসনপত্র কোনও কিছুরই খামতি রইল না।

গ্রামের লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, এ কার বিয়ে?

কেউ বলল, ওদের মেয়ের বিয়ে।

পরের দিন সকালবেলা খবর দেওয়া হলো পাত্রের বাড়িতে। ডাকাতের নাম শুনে পাত্রের বাবা কোনও আপত্তি করলো না।

বর-বধূ বিদায়ের সময় দুই ডাকাত ভাইয়ের চোখে জল। মেয়েটির চোখেও জল। দুই ভাই মেয়েটিকে বলল, তুমি তো জানো না আমরা কে?

মেয়েটি বলল, সে আমার জানার দরকার নেই। তোমরা আমার পরম আত্মীয়। আমি তোমাদের মেয়ে।

ডাকাত দুই ভাই বলল, তাহলে এই বাবার বাড়িতে আবার এসো।

মেয়েটি বলল, আসবো।

ইতিহাসে এই দুই ডাকাত দেবী ঘোষ ও নবীন ঘোষ নামে পরিচিত। শোনা যায় এই ঘটনার পর এরা ডাকাতি করা ছেড়ে দেয়।

(সংগৃহীত)

ভারতের পথে পথে

বুদ্ধগয়া

আড়াই হাজার বছর আগে তৎকালীন মগধ গণরাজ্যের নিরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব গ্রামে অশ্বত্থ গাছের তলায় বজ্রশিলায় বসে কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ তপস্যা করে ৪৯তম দিনে বৈশাখী পূর্ণিমায় সিদ্ধিলাভ করেন। কালে কালে সেই নদীর নাম হয়েছে ফল্গু। আর অশ্বত্থ গাছ হয়েছে বোধিবৃক্ষ আর বুদ্ধের স্মৃতিকে ঘিরে বুদ্ধগয়া। বর্তমানে বিহার রাজ্যে অবস্থিত। বুদ্ধজয়ন্তীতে দেশবিদেশ থেকে আসে ভক্তের দল। উৎসবের সাজে সেজে ওঠে বুদ্ধগয়া। বোধিবৃক্ষ ছাড়া মহাবোধি মন্দির, তিব্বতীয় মনাস্ট্রি, চীনা বুদ্ধিস্ট মন্দির, থাই মনাস্ট্রি বিশেষ দর্শনীয় স্থান।

জানো কি?

কোন শহরে কোন স্টেডিয়াম :

- ইডেন গার্ডেন—কলকাতা।
- বারবাটি—কটক।
- গ্রিনপার্ক—কানপুর।
- ফিরোজশাহ্ কোটলা—নয়াদিল্লি।
- যাববেন্দ্র—পাতিয়ালা।
- ওয়াংখেড়ে—মুম্বই।
- চিপক—চেন্নাই।
- সোয়াই মানসিংহ—জয়পুর।
- বল্লভভাই প্যাটেল—আহমেদাবাদ।
- মোহালি—পঞ্জাব।

ভালো কথা

প্রথম ও শেষ রুটি

পরীক্ষার পর ফালাকাটায় বাবা-মা'র সঙ্গে মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। রাত্রিবেলায় রান্নার সময় দেখলাম মামি প্রথম রুটি আর শেষে রুটিটি হটপটে না রেখে একটি থালায় রেখে দিল। জিজ্ঞাসা করাতে মামি বলল— প্রথম রুটিটা গোরুকে ও শেষেরটি কুকুরকে খাওয়াতে হয়। আমি বললাম, তোমাদের তো গোরু ও কুকুর দুটিই নেই। মামা বলল, নেই তো কী হয়েছে, রাস্তায় তো আছে। পরদিন সকালে মামা বলল— আয় দেখবি। মামা রুটি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতেই রাস্তার দুটি গাই ও কয়েকটি কুকুর ছুটে এল। মামা প্রথমে গাই দুটিকে ও পরে কুকুরগুলিকে রুটি টুকরো টুকরো করে খাইয়ে দিল। মা বলল— আমরা জানতাম না তো, কলকাতায় ফিরে আমরাও তাই করব।

রিঙ্কি বসাক, দশম শ্রেণী, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

নারী নিরাপদ নয়

রিম্পা পোল্লে, দশম শ্রেণী, শ্যামপুর, হুগলী

স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে চিৎকার করলেও
মেয়েরা এখনও স্বাধীন নয়,
সব সময় তার মনে ভয়, যদি হয় কোনও ক্ষতি!
সে ক্ষত তো ভুলবার নয়।
আজও মেয়েরা নিরাপদ নয় সমাজে
শুধু ভয় এই বুঝি হলো তার ক্ষতি,
কালরূপী নরকীট ওতপেতে থাকে
তাই ভয়ে ভয়ে থেমে যায় তার গতি।

আধুনিক আধুনিক বলে যতই করি বড়াই
তবু বেড়ে চলেছে নারী লাঞ্ছনার হার,
তাই ভয়ে ভয়ে থাকি, পলে পলে মরি
বুকে শুধু বেদনার পাহাড়।
জননীর জঠরের লজ্জা নরাধমরা
দাপিয়ে বেড়ায় বিশ্বময়,
এদিকে প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে
কত মেয়ের জীবন হয়ে যায় ক্ষয়।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

মঙ্গলনিধি

গত ৭ মার্চ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা সঙ্ঘচালক শুকদেব ভকত তাঁর দুই পুত্র অবিনাশ ভকত ও অভিষেক ভকতের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন রাষ্ট্রীয় সেবাভারতীর সংগঠন সম্পাদক রামপ্রসাদ নন্দীর হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৭ মার্চ আলিপুরদুয়ার জেলার বাবুরহাট সরকার পাড়ার বীর চিলারায় শাখার স্বয়ংসেবক তথা আলিপুরদুয়ার জেলা কার্যবাহ অলক রায়ের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে তাঁর দাদা প্রণব রায় মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন আলিপুরদুয়ার জেলা সঙ্ঘচালক রামবাবু গুপ্তার হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-কার্যবাহ মিন্টু কুণ্ডু, জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ সুশান্ত সাহা, জেলা শারীরিক প্রমুখ স্বপন সিকদার, জেলা প্রচারক পরিমল দেবশর্মা-সব বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

* * *

গত ৮ মার্চ আলিপুরদুয়ার জেলার ভোলার ভাবরির স্বয়ংসেবক তথা আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত রায়ের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে নব দম্পতি মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রচারক পরিমল দেবশর্মার হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রেসিডেন্ট গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও নেতা কর্মী।

শ্রদ্ধানিধি

মেদিনীপুর নগরের সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী মনোরঞ্জন সামন্ত গত ১৮ ফেব্রুয়ারি নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় গত ১১ মার্চ স্মরণ সভায় তাঁর ভাই বিনয় রঞ্জন সামন্ত বিভাগ সঙ্ঘচালক চন্দনকান্তি ভুঁঞ্যার হাতে শ্রদ্ধানিধি অর্পণ করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলাকার্যবাহ মৃণাল কান্তি খান, জেলা সেবা প্রমুখ দীপক সাহু, জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ সমীরণ গোস্বামী, জেলা সম্পর্ক নীলমণি দে প্রমুখ।

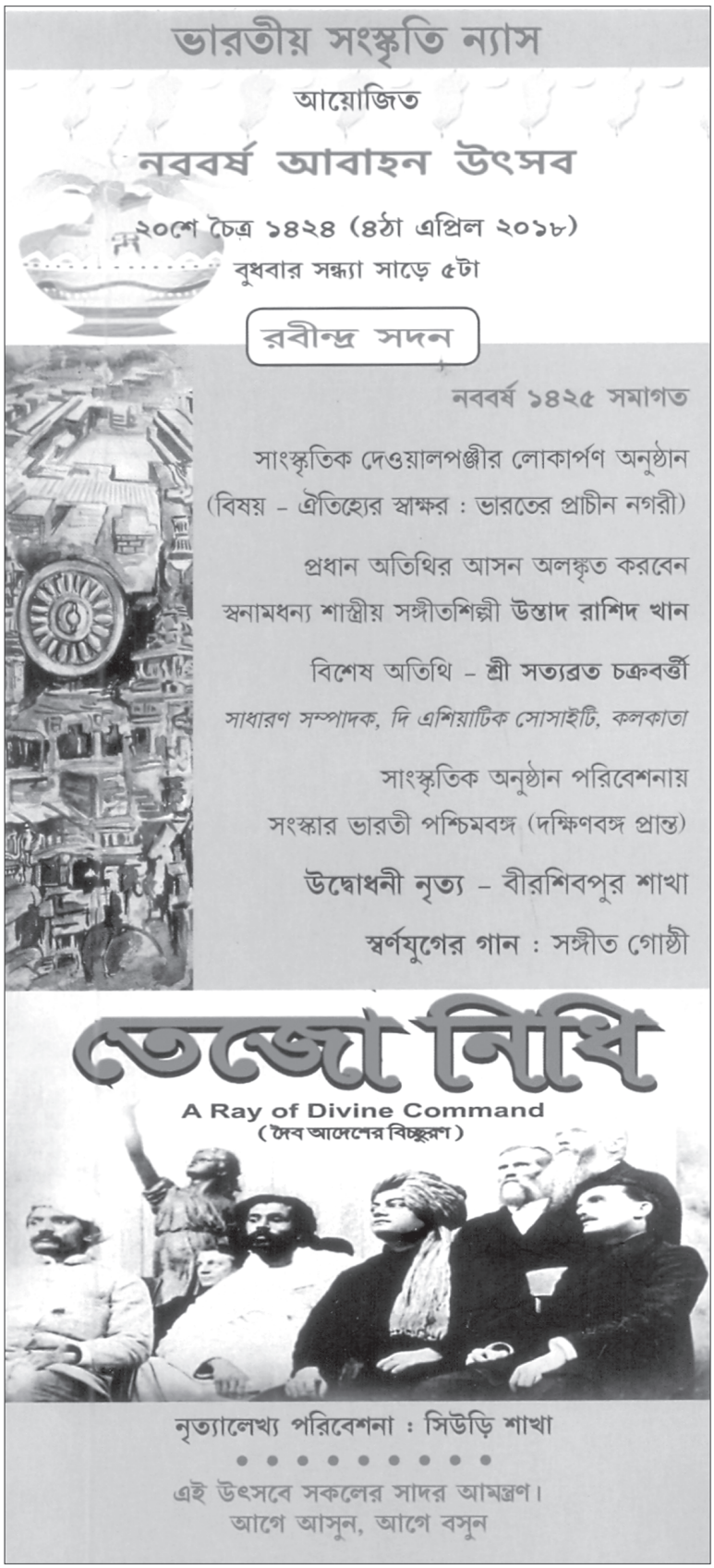

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
2 April - 2018 - Rs. 10.00

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. I I দাম ১০ টাকা I I